আকবরের জন্মদিন উপলক্ষে করাচীতে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিসভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ৭৫ বার্ষিক পারলৌকিক-স্মৃতি-সভার অধিবেশন নানা স্থানে হইয়া গিয়াছে।

দেশী সূতা—দেশী কার্পাস-সূত্রের উন্নতিকল্পে বাঁকিপুরে বেহার ইণ্ডষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েসনের একটী প্রদর্শনী হইবে। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। এই প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট চরকা এবং চরকায় কাটা সূতার জন্য পুরস্কার বিতরিত হইবে।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥"

(ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়)

—পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির চরণতরী সর্ব্ব-জীবের পরম আশ্রয়। যাঁহারা একান্ত-ভাবে তাহা আশ্রয় করিয়াছেন, কোনও বিপদেই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। এই দুস্তর ভবসাগর তাঁহাদের নিকট গোবৎসের ক্ষুদ্রতম পদচিহ্ন মাত্র। তাঁহারা যে পরম পদ লাভ করেন, তাহা শাশ্বত, আনন্দময়।

সেই শুদ্ধসত্ত্ব সচ্চিদানন্দকে আরাধনা করিতে হইলে, কপটতা, কুহক, দুরভি-সন্ধি একেবারে বিসর্জ্জন করিতে হয়। ভগবান্ দুষ্টের সহায় নহেন। তাঁহার সাধনায় ভাবশুদ্ধি ও ঐকান্তিকতা চাই। তুলসী বলিতেছেন,—

"কর্ম্ম বচন মন ছাড়ি ছল, জব লাগি
জনন ওদ্ধার।
তব লাগি সুখ স্বপনে হু নহি, কিয়ে
কোটি উপচার॥"

—হে মানব! যতদিন তুমি কপটতা বিসর্জ্জন করিয়া, কায়, মন ও বাক্য দ্বারা একান্তভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিতে না পার, ততদিন কোটি কোটি উপায় দ্বারা স্বপ্নেও তোমার সুখের আশা নাই।

ভগবান্কে কিরূপ ভাবে আশ্রয় করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য তুলসী পতিব্রতা রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন ;—

"পতিপ্রিয় নারী পতিব্রতা ছাড়ত নহি
পতি লেহ।
সেওত মন বচ কর্ম্মতে পতিচরণ অতি
স্নেহ।
জয় সে তনু ত্যজি ছাহ নহি, প্রভাত জহি
নহি তাহু।
চন্দ্র ত্যজহি নহি চন্দ্রিকা, পতিব্রতা তিয়
জাহু॥"

—পতি (সহস্র দুঃখ দিলেও) পতি-ব্রতা পতিকে ত্যাগ করে না। সে

কায়মনোবাক্যে অতীব অনুরাগে নিয়ত পতিচরণ সেবা করে। যেরূপ দেহের ছায়া দেহকে, সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যকে ও চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পতিব্রতা প্রাণান্তেও পতিকে ত্যাগ করে না। যে ভগবানের সেবক হইতে চায়, তাহারও ঠিক্ এই ভাবে তাঁহার সেবা করা উচিত। এ সেবা নীরস নহে, এ সেবায় একটী পরমাণুও বিফল হয় না। এ সেবা আদ্যোপান্ত নিরুপম মাধুর্য্যরসে পরিপ্লুত। জগতে ইহাই সফল সেবা। ভোগতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ভক্তকে বাহিরের বস্তু খুঁজিতে হয় না। সে "ঘরের মাঝে অমূল্য ধন" পাইয়া বিরলে উপভোগ করে; ক্ষণে ক্ষণে নব নব মাধুর্য্য সম্ভোগ করে। সে সম্ভোগে ক্লান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিঘ্ন নাই। যাঁহারা আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, জীবন্মুক্ত, যাঁহাদের কিছুই চাই না, তাঁহারাও এ অহেতুকী ভক্তি-সেবা ছাড়িতে পারেন না।

ভাগবতে কথিত আছে,—ভগবান্ ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করিয়া, প্রথমতঃ তাহা স্বপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। ইহা শুনিয়া শৌনকমুনি সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"শুকদেব নিবৃত্তি-নিরত, সম্পূর্ণ উদাসীন, জীবন্মুক্ত, আত্মারাম,—আত্মাতেই নিত্য সন্তুষ্ট, তিনি এ সুবিস্তীর্ণা ভাগবতসংহিতা অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে গেলেন কেন?" সূত কহিলেন;—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"
—ভাগবত, ১ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ১০ শ্লোক।

—ঠাকুরটী এমনি গুণের! এমনি তাঁহার আকর্ষণ! সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, আত্মারাম যোগীরাও তাঁহাকে অহেতুকী ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এ সংসারে অনেকেই ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন, তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য জপ-হোম-পূজাদিও করিয়া থাকেন, অথচ নিয়ত রোগ-শোকাদি দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, মনে বিন্দুমাত্র শান্তি পাইতেছেন না, ইহার কারণ কি? অনেকেই ভগবানের উপর এই অনুযোগ করিয়া থাকেন,—কৈ? আমি তাঁহাকে এত ডাকি, আমার বিপদ্ ত তিনি ঘুচাইলেন না। ইহার উত্তর এই যে,—তুমি ভগবান্‌কে ডাকিতেছ না, তুমি নিজ বিপদ্‌কেই ডাকিতেছ। তোমার মনটী আদ্যোপান্ত স্বার্থে ও কপটতায় পরিপূর্ণ। তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে, তাঁহাকে ধরিতে পারিলে, সকল দুঃখের শান্তি হয়, এটী অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু সেই স্মরণ ও সেই আহ্বান অন্তর্ভেদী হওয়া চাই। রোগার্ত্ত শিশু যেরূপে জননীকে আহ্বান করে, তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যে কণ্ঠে জলধরের নিকট বারিধারা প্রার্থনা করে, ভুজঙ্গধৃত ভেক যে স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, সেই তৃষ্ণা ও সেই আকুলতা চাই। তুমি ডাকিতে জানিলে, তোমার ডাক, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত

বাণের ন্যায় চক্রভেদ করিয়া লক্ষ্য বেধ করিবে। দ্রৌপদীর ন্যায় শান্তিদেবী স্বয়ং আসিয়া তোমাকে বরণ করিবেন। আহা! বাল্যের সেই অতীত ঘটনা আজি স্মরণ হইতেছে! শৈশবে রাত্রিকালে যখন পিতা মাতার যুগল বক্ষে সংলগ্ন হইতাম, তখন পিতৃদেব আমার জননীকে হর-গৌরী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির কথা বলিতেন। মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব ভগবৎসঙ্গীত শুনাইতেন; সে সঙ্গীতে পাষাণও দ্রব হয়। সে সঙ্গীতের প্রভাব অদ্যাপি হৃদয়ে জাগিতেছে। পিতামাতার একটী প্রিয়তম সঙ্গীত এ স্থানে উদ্ধৃত হইল;—

"মম মানস! ডাক তারা মায়ে। (ধুয়া)
মন ঐক্য কোরে, প্রাণ ঐক্য কোরে।
পুরিয়া রসনাযন্ত্র ডাক তারা মহামন্ত্র
যে নামে মুক্তি দিতে পারে।"

রে মানব!—তুমি সর্ব্বেন্দ্রিয় একীভূত করিয়া, মন-প্রাণকে একতানে একসুরে বাঁধিয়া, রসনাযন্ত্র ভরিয়া, মহামন্ত্র তারানাম গান কর, নির্ব্বাণ পাইবে। ভগবৎসাধনায় মন-প্রাণ-বাক্যের একতা ও ভক্তির গভীরতা থাকিলে সিদ্ধিবিষয়ে সংশয় নাই। দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে লোকের সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী গবেষণার ফল ব্যর্থ হইতে পারে। যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একদিন নিঃসংশয় সত্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাই আবার মিথ্যারূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু সরল প্রাণে নির্ম্মল ভক্তিমাত্র সম্বল লইয়া, ভগবানের আরাধনা করিলে, তাহা কস্মিন্ কালেও বিফল হইবার নহে। এ সাধনায় সিদ্ধি স্বসংবেদ্য। কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, সাধক স্বয়ং তাহা অন্তরে বাহিরে অনুভব করেন। যেমন মধুমাসের উদয়ে তরুলতায় বসন্তলক্ষ্মীর কমনীয় চিহ্নসকল প্রকাশ পায়, প্রকৃতিদেবীর অভ্যন্তর হইতে মধুধারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তেমনি, হৃদয়ে সেই প্রেমময়ের উদয় হইলে, সাধকের সর্ব্বাঙ্গে সাত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের ন্যায়, তাঁহার এক অপূর্ব্ব জন্মান্তর উপস্থিত হয়! চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুর ন্যায় তাঁহার হৃদয় প্রেমানন্দে উচ্ছলিত হইতে থাকে।

তুলসী বলিতেছেন;—

"মনক্রম বচন নেম করি, ভজন করত অতি প্রীত।
তবে বাঢ়ত হরিভক্তি দৃঢ়, উপজত প্রেম পুনীত॥
পুলক দেহ তব হোত হয়, হরিগুণ গাওত গান।
গদগদ গিরা তব হোত হয় বহত নীর-নিদান॥
তব হরিভক্তি সো জানিয়ে হোত কৃতারথ নেম।
এহি বিধি যাকো হোত, হয় উর অন্তর দৃঢ় প্রেম॥"

—কায়মনোবাক্য একীভূত করিয়া পরমপ্রীতিভরে শ্রীহরির ভজনা করিলে,

সাধকের হৃদয়ে হরিভক্তি বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির আবির্ভাবে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা, বদনে গদগদ ভাষে হরিগুণগান এবং সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ আবির্ভূত হয়। যাঁহার এ দশা ঘটে, তাঁহার অন্তরে হরিভক্তি জন্মিয়াছে, জানিও। যে ভাগ্যবানের এই প্রেম-ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি ভগবানের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় ও অভিন্নদেহ। এ বিষয়ে তুলসীর উক্তি, যথা ;—

"ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম, বপু এক।
ইন্‌কে পদ বন্দন করৈ, নাশৈ বিঘন অনেক॥"

—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ ও গুরু, এ চারিটী বস্তু নামমাত্রেই ভিন্ন, বস্তুতঃ একই পদার্থ। ভক্তের চরণ বন্দনা করিলে অশেষ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন ;—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

—সাধুরা আমার হৃদয়, আমিও সাধুদের হৃদয়। তাহারা আমা বিনা আর কিছু জানে না, আমিও তাহাদের বিনা আর কিছু জানি না।

৮ কাশীধামে সাধনার প্রথমাবস্থায় তুলসী সমস্ত দিবাভাগ জপে মগ্ন থাকিয়া, সায়ংকালে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া আসিবার সময় এক ময়রার নিকট কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভিক্ষা করিতেন। ময়রা পরমাদরে তাঁহাকে মিষ্টান্ন দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত। তুলসী দিনান্তে ঐ মিষ্টান্নের কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া পুনরায় জপে মগ্ন হইতেন। একদিন ঐ ময়রা দোকানে উপস্থিত ছিল না, তাহার ভ্রাতা ও কর্ম্মচারীরা ছিল। তুলসী তাহাদের নিকট মিষ্টান্ন প্রার্থনা করায়, তাহারা অতি রুক্ষ ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল ;— ওরে ভণ্ড ভেকধারি! লোভী সন্ন্যাসি! রোজ রোজ মজা পেয়েছিস্! চলিয়া যা, আর আসিস্ না।" ঐ তিরস্কারে তুলসী মরমে মরিয়া গেলেন, ভাবিলেন,—সত্যই ত আমি লোভী, উহারা ঠিক্ বলিয়াছে। আর কদাচ এ দুষ্কর্ম্ম করিব না। শ্রদ্ধাদত্ত অযাচিত তণ্ডুলকণা যদি সপ্তাহেও এক দিন মিলে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। অনন্তর তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একটী নিভৃত শিবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত তিরস্কারে তাঁহার নির্বেদ ও যোগতৃষ্ণা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি সেই মন্দিরের মধ্যে ক্রমে মহাযোগে মগ্ন হইলেন। একভাবে একাসনে প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এদিকে সেই ময়রা তুলসীদাসকে আসিতে না দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইল। যখন জানিতে পারিল, তাহারই লোকেরা সন্ন্যাসীকে গালি দিয়া তাড়াইয়াছে, তখন সে মর্ম্মাহত ও মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর শপথ করিল ;— "যাবৎ সেই সন্ন্যাসীকে আহার করাইতে না পারি, তাবৎ জলগ্রহণ করিব না।"

সে অনশনে থাকিয়া নিরতিশয় কাতরভাবে সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বিস্তীর্ণ কাশীক্ষেত্রের প্রতি মঠে, প্রতি ঘাটে, প্রতি মন্দিরে, প্রত্যেক স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। ক্রমে প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল; অহোরাত্র দারুণ উৎকণ্ঠায়, অনশনে ও অনিদ্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে কঙ্কালশেষ হইল, তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত হইল। শেষে সংবাদ পাইল, এক সন্ন্যাসী অমুক শিবালয়ে মহাসমাধিতে নিমগ্ন আছেন; প্রায় এক সপ্তাহ একভাবে আছেন, আহারাদি করেন নাই। তাঁহাকে আহার করাইবার জন্য বিবিধ মিষ্টান্ন লইয়া দলে দলে নরনারী তথায় যাইতেছে (১)। এই সংবাদ পাইয়াই ময়রার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল,—উনি আমারি সন্ন্যাসী। ভগবান্ নিশ্চয় এ হতভাগ্যের উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। উনি যে আমারি ঠাকুর, উনি ত আর কাহারও নহেন; উনি আমারি—আমারি—আমারি, এই বিশ্বাসে সে অন্ধ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে তৎক্ষণাৎ বাছা বাছা মিষ্টান্ন মাথায় করিয়া, উন্মত্তভাবে সেই মন্দিরের দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল,—সেই পরিচিত সন্ন্যাসী যোগমগ্ন, তাঁহার নয়নদ্বয় স্পন্দহীন, দেহ পাষাণবৎ নিশ্চল। তথায় এরূপ নিবিড় জনতা যে, তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে যাওয়া অসাধ্য ব্যাপার। যোগাবসানে তাঁহাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছে। ময়রা ভিড় ঠেলিয়া যাইতে অক্ষম হইয়া কাতরপ্রাণে মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। সে আজি সপ্তাহ উপবাসী; সন্ন্যাসী আজি তাহার হস্তে ভোজন না করিলে তাহার মৃত্যু অবধারিত। তাহার হৃদয়ের সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ভগবানের নিকট পঁহুছিল। যোগদর্শী মহাত্মারা বলিয়া থাকেন;—

"ভেরী যোজনশব্দা চ স্ফূর্য্যা দ্বাদশযোজনা।
ভক্তান্তর্গতশব্দস্ত ক্ষণাদাক্রম্যতে জগৎ॥"

- ভেরী যন্ত্রের শব্দ এক যোজন দূর গমন করে, বজ্রধ্বনি দ্বাদশ যোজন গমন করে, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ের কাতরধ্বনি ক্ষণমধ্যে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়, উহা চতুর্দ্দশ ভুবন ভেদ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়। তাই তাহার সে আর্ত্তনাদ ভগবানের নিকট পঁহুছিল; ভগবানের আসন টলিল। তখন তুলসী-হৃদয় ভগবান্‌রূপ আধারেই সংলগ্ন। আধার টলিলে আধেয়ও সেই সঙ্গে টলিতে থাকে। যেই ভগবানের আসন টলিল, অমনি তুলসী-হৃদয় বিচলিত হইল, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া

(১) যোগমগ্ন সন্ন্যাসীর যোগাবসানে তাঁহাকে আহার করাইলে, বিশেষ পুণ্যলাভ হয়। এজন্য সে সময় তাঁহাকে আহার করাইবার নিমিত্ত অনেকে যত্ন করে। তিনি প্রথমে যাহার হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহার মহাপুণ্য লাভ হয়। সন্ন্যাসী সেই খাদ্যের অধিকাংশ বিতরণ করেন, স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করেন।

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন। দূরে সেই ময়রাকে গলদশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে দীন-ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, তাহাকে সম্মুখে আনাইলেন। হে দয়াময়! হে ঠাকুর! এ দাসকে দয়া করুন, ক্ষমা করুন, আমার প্রাণ যায়, আমার মিষ্টান্ন ভোজন করুন, বলিতে বলিতে সে তুলসীর পদতলে পতিত হইল। তুলসী তাহাকে তুলিয়া, স্নেহমধুরবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাহার মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া তাহাকে ভোজন করাইলেন। তদবধি সে তাহার চির-সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি দীনসেবায় দান করিয়া, তুলসীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিল। সেই অযাচিত রাশি রাশি মিষ্টান্ন উপস্থিত দেখিয়া, নিম্নলিখিত দোঁহা তুলসীর মুখ হইতে বহির্গত হইল ;—

"বিন্ধ্য ন ইন্ধন পাইয়ে, সাগর জুরেন নীর।
পড়ে উপাস কুবের-ঘর, যও বিপক্ষ রঘু-বীর॥

তুলসী মাণ্ডত না মিলে চূণ।
যব কৃপা হুয়ে ভগবানকে
তব লুচই দুনো জূণ॥"

—ভগবান্ প্রতিকূল থাকিলে, বিন্ধ্য পর্ব্বতেও একখানি রন্ধনকাষ্ঠ মিলে না, সমুদ্রেও বারিবিন্দু মিলে না, কুবের-ভবনেও অর্থাভাবে উপবাস ঘটে। দেখ! তুলসী যখন আহার চাহিল, তখন একটা খুঁদও জুটিল না। কিন্তু যখন ভগবানের কৃপা হইল, তখন রাশি রাশি মিষ্টান্ন আসিয়া জুটিল। তিনি বলিতেন,—মায়াই জীবের অশেষ ক্লেশের নিদান। ঈশ্বর তোমা হইতে যত দূরে থাকিবেন, তোমার মায়া ততই বাড়িয়া যাইবে, আবার ঈশ্বর যতই সন্নিহিত হইবেন, মায়া ততই সঙ্কীর্ণ হইবে। ঈশ্বর যখন তোমার অন্তিকতম হইবেন, তখন তুমি মায়াকে পদদলিত করিয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে তাঁহার একটী সুন্দর দোঁহা আছে, যথা ;—

"রাম দূরী মায়া বঢ়তী, ঘটতী জান মন মায়।
ধূরী হোতী রবি দূরী লখি, শিরপর পগতর ছাঁহ॥"

ভগবান্ যত দূরে থাকেন, মায়া ততই বাড়িয়া যায়। দেখ! সূর্য্য তোমা হইতে যত দূরে থাকেন, তোমার ছায়া ততই বাড়িয়া যায়; সূর্য্য যত কাছে আসেন, ছায়া ততই কমিয়া যায়। (মধ্যাহ্নে) সূর্য্য যখন তোমার মাথার উপর, তখন তোমার ছায়া তোমার পদতলে লীন হয়। আবার দেখ!—সূর্য্যের দিকে তুমি সম্মুখ করিলে, ছায়া তোমার পিছু হটিয়া যায়, এবং সূর্য্যের দিকে তুমি পশ্চাৎ করিলেই ছায়া তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা সমাধিবলে সেই অচিন্ত্যবৈভব ব্রহ্মজ্যোতিকে অন্তিকতম করিয়াছেন, তাঁহাকে আপন আত্মায়

বাঁধিয়াছেন, তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী, তদ্ভিন্ন, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই ;—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"

(ক্রমশঃ)

রমণী-রত্নমালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

(কাশ্মীররাজ তুঞ্জীনের মহিষী বাক্‌পুষ্টা।)

বাক্‌পুষ্টা করুণেব বিগ্রহবতী
কাশ্মীররাজপ্রিয়া
দম্পত্যোঃ সুকৃতাবলী বিজয়তে
বিশ্বম্ভরাপাবনী।
যৌ দুর্ভিক্ষকরালরাক্ষসমুখগ্রস্ত-
প্রজারক্ষণে
সর্ব্বস্বং নিজজীবিতং চ যুগপৎ
ত্যক্তুং পণং চক্রতুঃ॥

—তুঞ্জীন কাশ্মীররাজ দয়া-অবতার,
বাক্‌পুষ্টা করুণাময়ী মহিষী তাঁহার ;
যাঁদের সুকৃতকীর্ত্তি ঘোষিছে ভুবন,
চিরজয়ী যাঁহাদের অমর জীবন।
হইল কাশ্মীরে যবে দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
রাজা রাণী প্রজাতরে সঁপিল জীবন ;
তাঁদের সুকৃতে প্রীত হ'য়ে পরমেশ,
অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা করিল সে দেশ।

প্রাতঃস্মরণীয়া নারী বাক্‌পুষ্টা কাশ্মীরপতি তুঞ্জীনের মহিষী ছিলেন। তিনি পতির সহিত সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে পতির অদ্বিতীয় সহায় হইলেন। এ সংসারে বিপদ্ ভিন্ন মনুষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যেন তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষার জন্যই রাজ্যে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। একদা ভাদ্রমাসে অকস্মাৎ ঘোর তুহিনপাত হওয়ায়, দেশের পাকোন্মুখ শালিশস্য সমস্তই হিমানীগর্ভে নিমগ্ন হইল। সেই সঙ্গে প্রজার জীবনাশা ও বিনষ্ট হইল। ক্রমে রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইল। অন্নাভাবে দিন দিন অসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখিয়া রাজদম্পতী প্রজারক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। যে যেখানে অনাহারে মুমূর্ষু, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া অন্নদান করিতে লাগিলেন। প্রজার জন্য বিদেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিতে ক্রমে রাজকোষ ও মন্ত্রিগণের সর্ব্বস্ব নিঃশেষিত হইল। মহিষী গাত্রের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া দিলেন ; রাজভবনে মৃৎপাত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল। মহিষী কাঙালিনীর বেশে আলুলায়িত কেশে গৃহে গৃহে অন্নমুষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। পিতা মাতা অপত্যপ্রেম, জায়া-পতি দাম্পত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নর, নারী, সকলেই সমভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। যাহারা

জীবিত, তাহারা কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট ; এক মুষ্টি অন্ন লইয়া মাতা-পুত্রে বিবাদ বাধিল। সমস্ত দেশ যমপুরীর ন্যায় ভয়ানক হইল। সেই লোমহর্ষণ সময়ে, গভীর নিশীথে, একদা নরপতি শয়নকক্ষে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহিষী দুর্দৈবশান্তিকামনায় ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্না ছিলেন, পতির রোদন শুনিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রাজা কহিলেন,—দেবি! রাজার পাপ ভিন্ন প্রজার অমঙ্গল হয় না। আমারি কোনো পাপে প্রজার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। যাহা কিছু উপায় ছিল, সকলি নিঃশেষ হইল। দেখ! চক্ষের উপর কত মহাপ্রাণী বিনষ্ট হইতেছে! শিশুগুলি মাতার বিবশ বাহুপাশ হইতে স্খলিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমার সেই অমরাবতী কাশ্মীর আজি মহাশ্মশান! এ স্থান হইতে পলাইয়া কাহারও প্রাণরক্ষার উপায় নাই, হিমসঙ্ঘাতে নির্গমপথ রুদ্ধ। দেবি! আমার প্রাণাধিক প্রজার এ সর্ব্বনাশ দেখিতে পারি না ; আমি জ্বলন্ত হুতাশনে এ দেহ আহুতি দিব। নরপতি এইরূপ কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মহিষীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। মহিষী এতক্ষণ নিস্পন্দভাবে ছিলেন ; অকস্মাৎ তাঁহার বদনে দিব্য জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। তিনি যেন দিব্য-শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইয়া, পতির চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন,—"নাথ! এ জগতে অসাধ্য-সাধনেই যদি সমর্থ না হইলাম, তবে আমাদের মহত্ত্ব কোথায়? কোন্ পিতা-মাতা মুমূর্ষু সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে? যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, আমাদিগকে অটল ভাবে প্রজা রক্ষা করিতে হইবে। আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতিলাভ কাপুরুষের কার্য্য। যদি একান্তই তাহা করিতে হয়, যতক্ষণ এ রাজ্যে একটীও প্রজার প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। অবশেষে তাহারও জীবন নির্ব্বাণ হইলে, আমরা উভয়ে সেই শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিব"। এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞীর বদনজ্যোতিঃ দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হইল, নয়নদ্বার হইতে তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতে লাগিল। রাজ্ঞী বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ! ভয় নাই—ভয় নাই! হে ধর্ম্মবীর উঠুন! উঠুন! আমি যদি পতি-সেবা করিয়া থাকি, যদি প্রজাদুঃখে আমার অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হইয়া থাকে, যদি একান্তচিত্তে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে আপনার প্রজাদিগের আর দুর্ভিক্ষভয় নাই।" অহো! পতিব্রতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! মহিষী সেই কথা বলিবামাত্র, শূন্যমার্গ হইতে অকস্মাৎ ভূরি ভূরি মৃত কপোত পতিত হইতে লাগিল। রাজা আশ্চর্য্য মানিয়া মরণোদ্যম হইতে বিরত হইলেন। প্রত্যহ সেই মৃত কপোত ভোজন করিয়া প্রজারা প্রাণধারণ করিল। সকলে বলিতে লাগিল ;—জগদীশ্বর মহিষীর সাধনায় প্রসন্ন হইয়াই, এই

অদ্ভুত উপায়ে আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিলেন। সকলে পরমানন্দে জগৎপতির অপার করুণা এবং সেই রাজদম্পতীর অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কৃপায় সে রাজ্যের সমস্ত দুর্দৈব দূর হইল, অচিরে তথায় প্রচুর শস্যরত্ন উৎপন্ন হইল।

ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রজাবৎসল মহারাজ তুঞ্জীন পরলোক গমন করিলেন। পতি-প্রাণা বাক্‌পুষ্টা প্রজাগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পতির সহগমন করিলেন। সেই সতী যে স্থানে পতির সহগমন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "বাক্‌পুষ্টাটবী" নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। (১)

(কৃষ্ণকুমারী।)

সহস্রশঃ ক্ষত্রিয়বীরকন্যাঃ
স্বধর্ম্মরক্ষার্থমরাতিহস্তাৎ।
সমাশ্রয়ন্ দীপ্তচিতাহুতাশং
প্রসূনশয্যামিব লীলয়ৈব॥

—সহস্র সহস্র ক্ষত্রবীরনারীগণ
শত্রু হৈতে নিজ ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
পুষ্পশয্যাসম সুখে চিতাহুতাশন—
আলিঙ্গিয়া বিসর্জ্জিল জীবন আপন।

জ্বালাং দীপ্তহুতাশনস্য বপুষি
স্নিগ্ধাং শরচ্চন্দ্রিকাং
তীব্রং কালভুজঙ্গমস্য গরলং
পীযূষবন্মন্যতে।
তীক্ষ্ণং খড়্গানিপাতমপ্যতিসুখং
পুষ্পপ্রবর্ষং যথা
মৃত্যুং মানধনায় ভারত-সতী
নির্ব্বাণবন্মন্যতে॥

—চিতাহুতাশনশিখা কালাগ্নিসমান,
শারদী-কৌমুদী-সম করে তারে জ্ঞান;
কালভুজঙ্গীর বিষ সুতীব্র ভীষণ,
জ্ঞান করে সুমধুর সুধার মতন;
নিজ অঙ্গে খরশাণ-কৃপাণ-আঘাত,
জ্ঞান করে সুখস্পর্শ পুষ্পবৃষ্টিপাত;
মানধর্ম্ম মহানিধি রক্ষণের তরে,
মৃত্যুকে ভারত-সতী মোক্ষ জ্ঞান করে।

তা ভারতব্যোম্নি কথাঃ সতীনাং
প্রদীপ্যমানাঃ প্রতিদীপ্তভারম্।
লীনেঽপি বিশ্বে প্রলয়াম্বুরাশৌ
সা নশ্বরা হ্যাস্যতি কীর্ত্তিরেকা॥

—সে সকল সতীকীর্ত্তি ভারত-অম্বরে
নক্ষত্রে নক্ষত্রে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে;
প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড যবে পাইবে বিলয়,
ভারতের সতীকীর্ত্তি রহিবে অক্ষয়।

ধন্যাসি হে কৃষ্ণকুমারি দেবি!
পীতং সুধাবদ্ গরলং ত্বয়া যৎ।
রাজ্যস্য তাতস্য চ রক্ষণার্থং
বালাঽপ্যহাসীস্ত্বমসূন্ সুখেন॥

—হে কৃষ্ণকুমারি! ধন্যা কে তব সমান?
হালাহল সুধাসম করিলে হে পান!
পিতার জীবন, রাজ্য, প্রজার জীবন—
রক্ষিতে বালিকা! সুখে ত্যজিলে জীবন।

কৃষ্ণকুমারী উদয়পুরের মহারাণা ভীমসিংহের কন্যা (১)। তাঁহার অতুল রূপ-লাবণ্য ও অলৌকিক গুণ রাজপুতজাতির

(১) কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী দেখ।

(১) সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক চিতোর নগর ধ্বংস হইলে, তদ্বংশীয় রাজারা উদয়পুরে রাজ্য স্থাপন

গৌরব। যৎকালে মোগলসম্রাট্‌গণের অদম্য শক্তির নিকট সমস্ত ভারতবর্ষ অবনত, রাজস্থানের ক্ষত্রিয়কুলতিলক নৃপতিগণ নিজ নিজ কুল, মান, মর্য্যাদা প্রভৃতি বলি দিয়া মোগলরাজলক্ষ্মীর আরাধনায় নিযুক্ত, তখন কেবল উদয়পুর আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সম্রাটেরা রাজপুতরাজকন্যাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতেন। কোনও কোনও রাজপুতরাজা ভয়ে ভয়ে মোগলরাজহস্তে কন্যা দান করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হইতেন। কেবল উদয়পুর নিজ কুলকে অকলঙ্ক রাখিয়াছিলেন। তৎকালে রাজস্থানের শত শত ক্ষত্রিয়রমণী অম্লানবদনে চিতানলে দেহ আহুতি দিয়া দুর্দ্দান্ত যবনহস্ত হইতে নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অকলঙ্ক নামকেই স্বর্গমোক্ষ জ্ঞান করিতেন, এবং সেই নামের জন্য জীবনকে তৃণকণা অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

কৃষ্ণকুমারী ১৭৯২ খৃষ্টশকে জন্মগ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তদীয় অসামান্য রূপলাবণ্যের ছটা, স্বভাবের অকৃত্রিম মাধুরী ও হৃদয়ের অতুলনীয় তেজ ও দৃঢ়তা বিকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে 'রাজস্থানের নলিনী' বলিত। কৃষ্ণকুমারী ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। মহারাণা কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স দেখিয়া উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি যোধপুরের রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত রাজা বিবাহের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অনন্তর অনেক অনুসন্ধানের পর শেষে জয়পুরের রাজার সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের কথা ধার্য্য হইল, এবং কুলপ্রথানুসারে উক্ত বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি হইল।

এদিকে এক আকস্মিক বিপদ্ উপস্থিত হইল। যোধপুররাজের মৃত্যুর পর, যিনি তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তিনি উদয়পুরের মহারাণার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন;—"আপনি প্রথমে যোধপুররাজের সহিত আপন কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে এক্ষণে আমি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত; এজন্য ধর্ম্মতঃ আমিই কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের অধিকারী। আমি আপনার নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমাকে কন্যাদান করুন।"

এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মহারাণা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। জয়পুররাজকে বা যোধপুররাজকে, কাহাকেও স্পষ্টাক্ষরে

করেন। তাঁহারা 'মহারাণা' নামে খ্যাত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত রাজবংশ। কথিত আছে,—তাঁহারা রাজটীকা দিলে রাজপুতানার অন্য রাজা স্বরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তৎকালে উদয়পুরের আর সে প্রভাব ছিল না। তথাপি সম্মানে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

কিছুই বলিতে পারিলেন না। নানা ব্যপদেশে কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। জয়পুররাজের সহিত সম্বন্ধ স্থির হওয়ায়, জয়পুররাজ কালবিলম্বে অসহিষ্ণু হইলেন। যোধপুররাজও শীঘ্র শীঘ্র বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ত্বরা দিতে লাগিলেন ও নানা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইল, মহারাণা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর, জয়পুররাজ ও যোধপুররাজ উভয়েই কৃষ্ণকুমারী লাভের জন্য বিপুল সৈন্য লইয়া উদয়পুর আক্রমণে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা উদয়পুর সীমায় উপস্থিত হইয়া, নিজ নিজ উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদলকে উদয়পুররাজ্যের লুণ্ঠনে উন্মুক্ত করিলেন। কামান্ধ, লুব্ধ সৈন্যেরা উদয়পুরে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। উন্মত্ত পিশাচগণ উদয়পুরের প্রজাগণকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে লাগিল প্রজাগণের ধন, প্রাণ, সতীত্ব হরণ করিতে লাগিল। এক্ষণে মহারাণাবংশের আর সে শক্তি ছিল না; বিশেষতঃ দুই প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা, তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। চৌদিকে রক্তস্রোত বহিতেছে, প্রজাগণের ধনপ্রাণাদি বিধ্বস্ত হইতেছে, হাহাকারে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছে, দিন দিন শত্রুসেনা রাজধানীর নিকটস্থ হইতেছে। পণ্যদ্রব্যাদির আমদানী রুদ্ধ হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, প্রজাসমেত সমস্ত রাজ্য ছারখার হয় প্রতীকারের উপায় নাই।

এই ভীষণ সঙ্কটে একদিন মহারাণা সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে ও মন্ত্রিগণকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া, কাতরস্বরে কহিলেন ;—"বৎসগণ! তোমরা আমার প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ, তোমাদের বিপদ্‌-সম্পদ্ই আমার বিপদ্ সম্পদ্। তোমাদের কুশলের জন্য আমি ধন প্রাণ সকলি বিসর্জ্জন করিতে পারি। এ বিপদে আমার কর্ত্তব্য কি? যেরূপে হয়, এ সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার কর। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ইহার প্রতীকারসাধনে কালবিলম্ব হইলে, এক প্রাণীও রক্ষা পাইবে না। আমি নিজে কিছুই স্থির করিতে পারি নাই; তোমরাই আমার বল, বুদ্ধি ও ভরসা, শীঘ্র উপায় বিধান কর।"

সভাস্থ সকলেই নীরব রহিলেন। মহারাণা বলিলেন :—"হায়! তোমরাও এ সময় মূক হইলে! এ সভায় এমন কেহই নাই যে, এ বিপদের প্রতীকার উদ্ভাবন করে? ওঃ! কি দুর্দ্দৈব! কি লজ্জার কথা! তোমরা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে রহিলে!

মহারাণার গভীর ক্ষোভপূর্ণ তিরস্কার-বাক্যে সভাসদ্‌গণের মধ্যে এক ব্যক্তি কর-যোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার নাম দেওয়ান আমির উদ্দীন। তিনি মহারাণার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। তিনি বিষণ্ণবদনে গদগদকণ্ঠে কহিলেন ;—"ধর্ম্মাবতার! এ বিপদে কেবল একমাত্র উপায় দেখিতেছি। ধৈর্য্য ধারণ করুন, বলিতেছি।" মহারাণা অধীরভাবে

কহিলেন ;—"বল! বল! শীঘ্র বল! আমি আদেশ করিতেছি, নির্ভয়ে বল! নিমেষমাত্রও বিলম্ব করিও না।"

সভাসদ্ আমির উদ্দীনের মনে যে ভীষণ উপায় উদিত হইয়াছিল, তাহা তিনি সাশ্রুলোচনে ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন ;—"মহারাজ! যাহার জন্য এই ঘোর অনর্থ উপস্থিত, তাহাই যদি বিলুপ্ত হয়, তবেই এ সঙ্কট কাটিতে পারে, অন্য উপায় নাই।"

আমির উদ্দীন ঐ কথা বলিবামাত্র সমস্ত সভা চমকিত হইল। গভীর শোকে ও ভয়ে সকলে যেন বজ্রাহত হইল। সকলে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ। সম্মুখে অকস্মাৎ কালসর্প ফণা তুলিলে লোক যেমন শিহরিয়া উঠে, মহারাণা তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন, বাতাহত কদলীর ন্যায় সিংহাসন হইতে পতিত হইলেন। মহারাণা কাহারও নিকট ওরূপ প্রস্তাব আশা করেন নাই। ঐ প্রস্তাবে রাজসভার চতুর্দ্দিক্ হইতে গভীর শোক ও ক্রোধসূচক ধিক্কার উত্থিত হইল। কেননা, সেই কন্যারত্ন কৃষ্ণকুমারী সমস্ত রাজস্থানের ভূষণ, তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। সেই রাজবালার দীনদয়া ও পরোপকার দর্শনে তাঁহার উপর প্রজাগণের প্রগাঢ় অনুরাগ। কিন্তু হায়! সেই ঘোর সঙ্কটে হতাশ ও উদ্‌ভ্রান্ত মহারাণার চিত্তে ক্রমশঃ উক্ত প্রস্তাব বদ্ধমূল হইল। তিনি একবার ভাবেন, হায়! কৃষ্ণকুমারী যে আমার প্রাণনাড়ীর বন্ধন, হৃদয়ের স্নেহসার; সেই প্রাণপ্রতিমা কন্যাকে, পিতা হইয়া কিরূপে হত্যা করিব? এ কার্য্য করিতে যে নৃশংস রাক্ষসেও পারে না। আবার ভাবেন ;—সমস্ত প্রজার ধন, প্রাণ, মান কি একটী কন্যা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর বস্তু নহে? বিপদ্ ঘনীভূত; শত্রুগণ ক্রমেই রাজধানীর সন্নিহিত হইতেছে, অবিলম্বে প্রতীকার আবশ্যক, নহিলে সমূলে নিপাত।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে তিনি সেই ভীষণ প্রস্তাবকেই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। ঘোরতর দুশ্চিন্তায়, অনাহারে, জাগরণে মহারাণা যেন শবদেহে পরিণত হইলেন। ভাবিলেন,—অহো! কি দুর্দ্দৈব! পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাপ করিয়া, এজন্মে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছি! কৃষ্ণকুমারী যে আমার সর্ব্বস্ব-ধন! 'মা মা' বলিয়া আদর করিয়া যে সুকুমারীর কোমল অঙ্গে ভূষণ ও অনুলেপন দিয়াছি, কোন্ প্রাণে সেই অঙ্গে খড়্গাঘাত করিব! সোহাগ করিয়া যে চাঁদমুখে সুধাসম ভক্ষ্য পেয় দান করিয়াছি, কোন্ প্রাণে সেই মুখে তীব্র-হালাহল দান করিব! মা! বসুন্ধরে! বিদীর্ণ হও, এ মহাপাপীকে শীঘ্র বিলুপ্ত কর। অহহ! না,—না, এ কার্য্য করিব না, কখনই নয়। পরক্ষণেই ভাবিলেন, ওঃ! এ কার্য্য করিতেই হইল। আর উপায় নাই। আমার পুত্রাধিক প্রজারা নিষ্ঠুর-ভাবে হত হইতেছে, আমার রাজ্য মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই ঘোর

বিভীষিকা! মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! আর বিবেচনার সময় নাই।

প্রজার আর্ত্তনাদে ও দুশ্চিন্তায় মহারাণা ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। অবশেষে প্রজারক্ষার জন্য প্রিয়তমা কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ কার্য্য কে করিবে? নিরপরাধা সুকুমারী বলিকা—রাজস্থান-নলিনীর কোমল অঙ্গে কে খড়্গাঘাত করিবে? এ কার্য্য তো রাক্ষসেও করিতে পারে না। শেষে অনেক চেষ্টায়, মহারাণার কোনও জ্ঞাতি-যুবক এ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কৃষ্ণকুমারীকে এ কথার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে দেওয়া হইল না। নিরপরাধা লীলাময়ী বালিকা আপন পরিণামের বিষয় কিছুই জানিলেন না। সেই জ্ঞাতি-যুবক রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বিশেষতঃ কৃষ্ণকুমারীকে সে সোদরার ন্যায় ভাল বাসে, কিন্তু রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। সে মহাসঙ্কটে পড়িল। গভীর নিশীথে যখন সেই ভীষণ রাজাজ্ঞা-পালনের সময় উপস্থিত, তখন সে খড়্গ-হস্তে স্খলিত পদে, অলক্ষ্য ভাবে রাজকন্যার শয়নাগারে চলিল। তাহার জ্ঞান হইল, প্রতিপদক্ষেপে ধরণী বিদীর্ণা হইয়া যেন মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা। সে সাশ্রুলোচনে কম্পান্বিত-কলেবরে বারবার ধরণীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল;—যেন তাহার হস্ত নিরপরাধা বালিকার রক্তে কলঙ্কিত না হয়, যেন এ রাত্রিতে কৃষ্ণকুমারীকে তাহার শয়নাগারে না পাওয়া যায়। ক্রমে অন্তঃপুরের বহু কক্ষ অতিক্রম করিয়া, রাজকন্যার শয়নাগারে প্রবেশ করিল। দেখিল,—বালিকা নিদ্রা যাইতেছেন, গৃহ-প্রান্তে দীপাধারে আলোক জ্বলিতেছে; সেই স্তিমিত আলোকপ্রভা নিদ্রিতা কুমারীর লাবণ্যময় মুখকমলে পতিত হওয়ায়, তাহা হইতে প্রশান্ত, পবিত্র, অপরূপ রূপমাধুরী উদ্ভাসিত হইতেছে! সেই দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি যেন বলিতেছে,—এ সংসারে পাপ নাই, তাপ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, কলহ নাই; আমরা সকলেই সেই প্রেমময়ী বিশ্ব-জননীর সন্তান। এক রক্তে এক মাংসে একই মায়ের স্নেহে আমরা পালিত। আমাদের মা আনন্দময়ী—শান্তিময়ী—দয়াময়ী—সর্ব্বমঙ্গলা—জন্মভূমি। দেবতা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেরি মা তিনি, সকলেরি উপর তাঁর সমান প্রীতি, সমান যত্ন, প্রাণের সমান টান। বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা যত্ন করিয়া নানা সুগন্ধি কুসুম চয়নপূর্ব্বক, তাঁহার শয্যায় বিকীর্ণ করিয়াছিল, স্নেহভরে তদীয় কণ্ঠে ফুল্ল নবমল্লিকামালা পরাইয়াছিল; সে সকল কুসুম অম্লান রহিয়াছে, বরং তাঁহার বরাঙ্গস্পর্শে অধিকতর সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করিতেছে। সেই ঘাতুক ক্ষত্রিয়-যুবা রাজাজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া, নিস্পন্দভাবে ও নির্নিমেষনেত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্বর্গীয় রূপমাধুরী দর্শন করিল। অনন্তর হঠাৎ তাহার রাজাজ্ঞা স্মরণ হইল।

তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য, তাহা যতই কঠোর হউক, ভৃত্যকে পালন করিতে হইবেই। কঠোর কর্ত্তব্যপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যুবক তখন দৃঢ় হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া, রাজকন্যার শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঠিক্ প্রহারের সময় তাহার হস্ত অবশ হওয়ায়, ঝনঝনা শব্দে অসি ভূতলে স্খলিত হইল, এবং সেই সঙ্গে তাহার নেত্র হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল। খড়্গাপতনের শব্দে অন্তঃপুরবাসিনীরা জাগিয়া উঠিল, এবং ভয়বিহ্বলচিত্তে ঐ শব্দের কারণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণকুমারীও জাগিয়া উঠিলেন এবং তথায় সেই আত্মীয় যুবককে দেখিয়া এবং সম্মুখে ভীষণ খড়্গা পতিত দেখিয়া তাহাকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর যখন সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন, তখন তাঁহার দেহের একটী শিরাও বিচলিত হইল না, বদনে অণুমাত্র বিকার লক্ষিত হইল না, কণ্ঠস্বর স্থির, ধীর; কেবল তাঁহাতে সে বালিকাভাব—সে সুকোমল শিশুমাধুর্য্য—সে মধুর চপলতা লক্ষিত হইল না। যেন কোনও ইন্দ্রজালপ্রভাবে তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে প্রৌঢ়া ক্ষত্রবীরাঙ্গনার অলদনলকল্প তেজ ও শক্তি লাভ করিলেন। তিনি সদর্পে সেই যুবককে কহিলেন;—"তুমি আমার পিতাকে গিয়া বল;—আমি রাজপুতকন্যা। রাজপুতবালা মৃত্যুকে ভয় করে না, এ কথা কি পিতা বিস্মৃত হইলেন? আমি যখন পিতার জন্য, প্রজার জন্য, আত্মমর্য্যাদার জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তখন কাপুরুষের ন্যায় এরূপ গোপনে পিতা আমাকে কেন হত্যা করেন? কর্ত্তব্যপালনের নিকট যমদণ্ডের ভয় তো উপহাসের কথা। পিতৃকার্য্যের নিকট অমরাবতীর বৈভবকে আমি ধূলিকণা জ্ঞান করি। পিতার ইচ্ছায় এ বালিকা স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিতে কুণ্ঠিতা নহে। ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি শীতল জলে অবগাহন করিয়া যে শান্তিলাভ করে, ক্ষত্রিয়বালা ধর্ম্মের জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া ততোধিক শান্তি লাভ করে। আমি বালিকা হইলেও, এ দেহের শিরায় শিরায় সে আর্য্যতেজ—সে আর্য্যশোণিত—সে বীর্য্যহুতাশন বিদ্যুৎপ্রভায় প্রদীপ্ত। হা বিধাতঃ! রাজপুতরমণী প্রাণ দিতে ভয় করে, কি ঘৃণার কথা! কি কলঙ্কের কথা! অহো! আমার কি শুভ দিন! প্রজার জন্য প্রাণ দিব!—পিতার বিপদ্ উদ্ধার করিব! কি শুভক্ষণে জননী আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন! আজি ক্ষত্রকুলে আমার নারীজন্ম সার্থক, আমার উপর ঈশ্বরের অপার করুণা। বিষপানে, শস্ত্রাঘাতে বা অগ্নিকুণ্ডে, পিতা যে উপায়ে বলিবেন, আমি এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিব। পিতার শান্তিলাভের জন্য প্রাণ দান করিব, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি আছে?

কৃষ্ণকুমারীর জননী অসহ্য বেদনায়

উন্মাদিনীর ন্যায় কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মর্ম্ম-স্থান যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। রাজ-পরিবারের আর্ত্তনাদে রাজপুরী প্রতি-ধ্বনিত হইল। কৃষ্ণকুমারী পরম যত্নে জননীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন;—"আপনি সূর্য্যকুলতিলক মহারাণার মহিষী। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে এ বংশের কেহ কখনও কাতর নহে। মা! তুমি শোক করিও না। সকলি সেই মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছা। আমার প্রাণত্যাগের সঙ্গেই আমার পরমারাধ্য পিতার রাজ্য শান্তি-লাভ করিবে, নিরপরাধ প্রজাগণের এ সর্ব্বনাশ নিবারিত হইবে। মা! পিতা-মাতার মঙ্গলকামনায় প্রাণ দান করা অপেক্ষা সন্তানের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? আমি নিজ জীবন অপেক্ষা তোমাদের মঙ্গলকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করি। মা! তোমাদের বিপদুদ্ধার কি আমার ক্ষণভঙ্গুর জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম নহে?"

কৃষ্ণকুমারীকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা না করিয়া, বিষপ্রয়োগে হত্যা করাই শেষে স্থিরীকৃত হইল। বিষপূর্ণ পাত্র তাঁহার নিকট আনীত হইল। কৃষ্ণকুমারী ভক্তি-গদগদ চিত্তে ভগবান্‌কে প্রণাম করত, সানন্দে তাহা পান করিলেন। জননী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল, তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু সে বিষপানে তাঁহার মৃত্যু না হওয়ায়, দ্বিতীয়বার বিষপাত্র আনীত হইল। কৃষ্ণ-কুমারী সানন্দে পিতা-মাতা ও ঈশ্বরের স্তব করিয়া, তাহা পান করিলেন। তথাপি তাঁহার মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। শোকে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিল;—ঈশ্বর ইঁহার প্রাণ-হরণ করিতে অনিচ্ছুক। কৃষ্ণকুমারী তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন;—হায় রে! মরণ কি এত কঠিন? দয়াময়! সর্ব্বসাক্ষিন্! জগদীশ! তুমি আমার হৃদয় জানিতেছ, আমি যদি পিতার ও রাজ্যের বিপদুদ্ধারের জন্য পরমানন্দে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকি, তবে এবার যেন এ গরলের শক্তি বিফল না হয়। পরিচারকেরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেবল রাজদণ্ডভয়ে তৃতীয়বার বিষপাত্র আনয়ন করিল। কৃষ্ণকুমারী পিতৃ-রাজ্যের কুশল প্রার্থনা পূর্ব্বক, গভীর ভক্তিভরে সেই বিষ পান করিলেন। এবার ক্ষণমধ্যেই বিষশক্তি প্রকট হইল। সেই কমললোচনার লোচনযুগল অল্পে অল্পে মুদ্রিত হইয়া আসিল। শোকোন্মত্তা জননীর ও শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের পাষাণ-ভেদী আর্ত্তনাদ আর তাঁহার কর্ণে পশিল না। যে কণ্ঠ হইতে ক্ষণপূর্ব্বে বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে ভগবৎসঙ্গীত উত্থিত হইতে-ছিল, তাহা নীরব হইল। জ্ঞান হইল যেন তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া অমৃত-রসের প্রস্রবণে অবগাহন করিতেছেন। প্রেমভরে চক্ষু দুটী হইতে পদ্মাগ্রবিলম্ব অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলি ফুরাইল। বিষপানকালে সেই বিম্বাধরে

যে মধুর হাস্যরেখা ফুটিয়াছিল, কেবল তাহাই ফুরাইল না। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—সেই গতাসু রাজবালার অধর-পল্লবে চন্দ্রিকার ক্ষীণ আভার ন্যায় সেই হাসিটুকু লাগিয়া আছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—ধর্ম্মের জন্য রাজপুতরমণীরা সহাস্যমুখে চিতারোহণ করে, তিনি তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। ভারতের অকলঙ্ক চন্দ্রমা—সে ত্রিদিব-দুর্লভ রমণী-রত্ন পিতৃরাজ্যের কল্যাণার্থে প্রফুল্লহৃদয়ে সহাস্যমুখে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

অভাগা ভারতসন্তান! তোমরা বিশ্বজয়ী বীর হইয়াও, তুচ্ছ রমণীর লালসায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, আত্মদ্রোহের অনলে ভারতলক্ষ্মীকে দগ্ধ করিলে! তোমাদের এ কলঙ্ককালিমা জগতের ইতিহাসে অবিলুপ্ত থাকিবে। কথিত আছে, তুচ্ছ স্ত্রীলোক লইয়া মহারাজ পৃথ্বীরাজ ও কনোজরাজ জয়চন্দ্র—উভয়ে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তৎকালে দিগ্‌বিজয়ী সাহেব উদ্দীন ঘোরি ভারতবর্ষজয়ে সমুৎসুক। পৃথ্বীরাজ তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া দূতমুখে ব্যাজচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"হে বীরবর! আপনাদের সুশীতল দেশের আঙ্গুর, খর্জ্জুর প্রভৃতি সুকোমল ফল ছাড়িয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া এ দেশে আসিতেছেন কেন? এ দেশের মৃত্তিকা বড় কঠিন; এ স্থানের বিল্ব, বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি কঠিন ফলে দন্তস্ফুট হয় না।" এই ব্যাজোক্তির মর্ম্ম এই—অদম্য ক্ষত্রিয়-বীরের ভুজবলরক্ষিত এ ভারতবর্ষকে জয় করা কঠিন, ইহা বহিঃশত্রুর অভেদ্য। চতুর ঘোরি এই ব্যাজোক্তির অর্থ বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"হাঁ, হিন্দুস্থানের মৃত্তিকা কঠিন বটে; কিন্তু ঐ স্থানে 'ফোট' নামক ফল আছে; আমরা সেই লোভেই যাইতেছি (১)।" শেষে ঘোরির কথাই ফলিল। স্বজাতীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দুস্থান পরহস্তে পতিত হইল।

ভারতের বামাগণ স্বদেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, আত্মমর্য্যাদার জন্য হাসিতে হাসিতে জলন্তচিতায় দেহ আহুতি দিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল নহে।

সম্রাট্ আকবর যখন ছলে বলে চিতোর অধিকার করিলেন, চিতোরের পুরুষগণ সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য চিতোররমণীরা অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি দিয়া নিজ সতীত্বও সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সমৃদ্ধিশালী, জনকল্লোলপূর্ণ মহেন্দ্রপুরী অচিরে মহাশ্মশানে পরিণত হইল। পাষাণচিত্ত আকবরও সে দৃশ্যদর্শনে অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। কোনও পরিব্রাজক সতীগণের সেই মহাসমাধি দর্শন করিয়া বলিয়াছেন;—চিতোরের ভগ্নবক্ষে এখনও যেন সারি সারি চিতানল জ্বলিতেছে।

---

(১) "ফোট" অর্থাৎ ফুটি; ফুটি বড় হইয়াই ফাটিয়া যায়, এজন্য উহা ভাঙ্গিতে কষ্ট হয় না।—অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ফোট অর্থাৎ প্রবল গৃহচ্ছিদ্র বিদ্যমান।

তদুপরি যেন অসংখ্য দেবযান দিব্য প্রভায় দিঘ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সেই সকল সতী-মূর্ত্তির তেজঃপুঞ্জ যেন সেই মহাশ্মশানের ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোম হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

সতীগণের দেহভস্মপূত সেই মহা-তীর্থকে সপুলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি।

(ক্রমশঃ।)

বটবৃক্ষের কাহিনী।

কত যুগ, কত কাল এই নদীতটে দাঁড়াইয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। কত বার সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিলাম, ছয় ঋতুর যাতায়াত দেখিলাম, জগতের কত সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, জন্ম মৃত্যু দেখিলাম, তাহার হিসাব দিতে পারি না। আমি শুধুই দাঁড়াইয়া আছি!

এক জীবনে কতই দেখিলাম! অই নদীতে লাল নিশান উড়াইয়া রাজার বজরা আসিতে দেখিয়াছি; আবার ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি ও ডোঙ্গা ভাসিতে দেখিয়াছি; শাঁখা সাড়ী সোণা রূপায় বিভূষিতা কুলবধূগণকে গঙ্গা পূজা করিতে আসিতে দেখিয়াছি, আবার সদ্য বিধবাকে শাঁখা চুড়ী ভাঙ্গিয়া প্রথম বৈধব্য-স্নান করিতে দেখিয়াছি! কতই দেখিলাম!

কেন এতদিন আছি?—সে কথা আমি জানি না। বুঝি জগতের কেহই সে তত্ত্ব জানে না। তবে এই যে বিপুল দেহ, এই যে পল্লবমর্ম্মরিত স্নিগ্ধ সমীর, এই যে মানবের মাতৃক্রোড়তুল্য সুশীতল শান্তিময়ী ছায়া, এ সব যে বিশ্বস্রষ্টার শুধু খেয়াল মাত্র নহে, এ কথা বুঝিতে পারি। সেই জন্য যখন আমার কোটরে বিহঙ্গকুল নীড় নির্ম্মাণ করে, নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন পথিকগণ ও রাখাল বালকেরা আমার ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, যখন শ্রান্ত পশু আমার কাছে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধনীলিত নেত্রে রোমন্থন করে, তখনই এ জীবনের সার্থকতা অনুভব করি। মনে হয় বিশ্বজীবন পরের মঙ্গলের জন্য—আমার এই নগণ্য জীবনও পরের মঙ্গলের জন্য মনে হয়। বিশ্বদেবতার ব্রহ্মাণ্ডযজ্ঞে আমিও এক উপকরণ, আমিও অনর্থক নহি।

আমার বামদিকে ঐ দূরে মহাশ্মশান! ঐখানে কত কি দেখিয়াছি! কত সতী-লক্ষ্মীকে পতির শব বক্ষে লইয়া জলন্ত আগুনে পুড়িতে দেখিয়াছি, কত শিশু কত যুবা, কত বৃদ্ধকে জন্মের মত শয়ন করিতে দেখিয়াছি, কতই মর্ম্মভেদী বিলাপ শুনিয়াছি!

আর এক সময়ে যাহা দেখিয়াছি, তাহা—সে কাহিনী এ জনমে ভুলিতে পারিব

না। সেদিন অনেক দিন গিয়াছে, কিন্তু সেই স্মৃতিই এই জীবনের অবলম্বন।—আহা সেই শৈলজা! সে বিধবা মাতার একমাত্র কন্যা; বালিকা রাঙাপেড়ে কাপড় পরিয়া, ফুলের সাজি হাতে করিয়া মায়ের সঙ্গে ঘাটে আসিত, মা শিবপূজা করিতেন, বালিকা নিস্পন্দ হইয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিত, তার রূপে ঘাট আলো হইয়া থাকিত; মা পূজাশেষে বাছার সুখ সৌভাগ্য কামনা করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, সেই সময়ে বালক সুধীর ছুটিয়া আসিত। সে শৈলর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিত, শৈলর শূন্য ফুলের সাজি আপন হাতে লইত, নিজের ছত্রতলে শৈলকে টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে, দু'টি নবফুট পদ্মফুলের মত দুজনে বাড়ী যাইত। সুধীরের মুখ দেখিয়া মনে হইত সে যেন শৈলকে জগতের কোন বাধা লাগিতে দিবে না। তখন সুধীরের বয়স চৌদ্দ; শৈল আট বছরের।

কতদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুধীর ও শৈল ঐ বাঁধা ঘাটে বসিয়া কত খেলা করিত; পশ্চিমের আকাশের সূর্য্যাস্ত-শোভায় দুজনের সুন্দর মুখ কতই সুন্দর দেখাইত; তাহারা মোচার খোলায় নৌকা গড়িয়া জলে ভাসাইত; জলের ছায়ায় মুখ দেখিত; আমার পল্লবগণনা করিত; দাঁড়ী মাঝিদের গান শুনিত; শেষে দুজনে ছুটা ছুটি করিতে করিতে বাড়ীর দিকে যাইত। তাহাদের সেই মধুর কথা, মধুর হাসি সমস্ত রাত্রি আমার বুকে প্রতিধ্বনিত হইত!

ক্রমশঃ সুধীর ও শৈল বড় হইতে লাগিল। তথাপি আমার তলায় তাহারা আসিত। দুজনের কত আদর, কত আশা, কত কল্পনা আমি কাণ পাতিয়া শুনিতাম। জনসমাগম দেখিলে শৈল আমার অন্তরালে আপনাকে লুকাইত দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইত.. আমি মনে মনে হাসিতাম।

এই রকমে কত দিন কাটিল। শেষে শৈল যখন চৌদ্দ বৎসরের হইল, তখন দেখিলাম শৈলের সীঁথিতে সীঁদুর, হাতে শাঁখা। একদিন আমার ছায়ায় দাঁড়াইয়া, মাথার কাপড় খাটো করিয়া শৈল সুধীরকে বলিতে লাগিল,—"তুমি কেন এ কাজ করিলে?—আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে কেন?" সুধীর হাসিল; সে বরাভয়প্রদ, জয়গর্ব্বদৃপ্ত উল্লাসের হাসি হাসিয়া বলিল,—"তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে শৈল? আমায় কি তোমার পছন্দ হয় নাই?" সলজ্জভাবে শৈল বলিল—"যাও!"

পশ্চিমের আকাশে সূর্য্যের উদয় হওয়া যতটা অসম্ভব, এই দম্পতীর পরস্পরকে "অপছন্দ" হওয়া ততটা অসম্ভব; দুজনেই তাহা জানিত, তাহা বিশ্বাস করিত। তথাপি যে এমনতর কৃত্রিম কলহে প্রণয়ী-দিগের যে কি সুখ, তাহা প্রণয়ীরাই বোঝে; আমি বটবৃক্ষ, এই কাষ্ঠহৃদয় লইয়া কি করিয়া বুঝিব?

একটু পরে শৈল কাতরস্বরে বলিল,—"দেখ, ঠাট্টা তামাসা নয়; বল দেখি,

তোমার জেঠা মহাশয় দেশে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া কি বলিবেন?"

সুধীর গম্ভীরভাবে বলিল,—"জেঠামহাশয় যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন, তাহাতে আমি একবিন্দু কাতর নহি। তারপরে তোমার মা, আর আমার মা, দুজনে ইচ্ছা করিয়া যখন আমাদের বিবাহ দিয়াছেন, তখন জেঠা মহাশয় রাগ নাও করিতে পারেন।" শৈল অন্যমনে আমার একটী পাতা তুলিয়া লইল, তাহাই ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল—ম্লান মুখে বলিল, "তুমি অমন ভরসা করিও না; তোমরা কুলীন, আমরা বংশজ, এ বিবাহে যে তোমার কুলভঙ্গ হইয়াছে, জেঠা মহাশয় এমন অপরাধ কখনই ক্ষমা করিবেন না।" শৈলর নীলোৎপলতুল্য চক্ষু জলভরে ছল ছল করিতে লাগিল; অভিমানিনী আনতমুখে দাঁড়াইল।

দেখিয়া সুধীর দৃপ্ত সিংহের মত গর্ব্বিত-ভাবে বলিতে লাগিল,—"ও কি বলিতেছ শৈল? কুল চুলায় যাউক, জেঠা মহাশয় ফাঁসির ব্যবস্থা করিলেও আমি একবিন্দু কাতর নহি, ইহা নিশ্চিত জানিও। পৃথিবীর সকল দুঃসহ কষ্ট যদি আমার জন্য আসে, তাহাতেও আমি ভ্রূক্ষেপ করিব না। 'শৈলজা আমারই' এই কথাই আমার অমৃতময় মন্ত্র।—তুমি কি তা বোঝনা শৈল?"

আমি দেখিলাম,—সে আদরে শৈল গলিয়া গেল, তার চক্ষের জল উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

আহা! এই ফুল্ল-কুসুম-তুল্য কিশোর-কিশোরী যখন আমার "বটতলা" আলো করিয়া দাঁড়াইত, তখন আমার এই "কাষ্ঠ-হৃদয়" যেন সজীব ও কৃতার্থ হইত।

একদিন অই বাঁধা ঘাটে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বজ্র-নিনাদে বলিতেছেন,—"আমি অপুত্রক, সুধীর আমাদের একমাত্র বংশধর; দুই জন কুলনাশিনী কালভুজঙ্গী একত্র হইয়া কৌলীন্যদেবতাকে ধ্বংস করিয়াছে। আচ্ছা, এ কাজের প্রতিফল আমি অবশ্য দিব; হয় সুধীর সেই স্ত্রীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করুক, নয়তো সুধীরকে সেই দুই কুলনাশিনীর সমক্ষে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তার রক্ত কুকুর দিয়া খাওয়াইব, তবে তোমরা জানিও আমার নাম মহাদেব চাটুয্যে।"

পরপীড়ক প্রতিবাসীরা ইহাতে খুব খুসি হইয়া আগুনে "ইন্ধন" দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুএকজন সহৃদয় ব্যক্তি মৃদুভাবে দু একটী সান্ত্বনার কথা বলিতে গিয়া লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত হইলেন।

হায়! চাটুর্য্যে মশাই! তোমার রক্ত-মাংসের হৃদয় কি এত কঠিন? আমি যে বৃক্ষ—আমার হৃদয় যে কাষ্ঠখণ্ড, আমি তো সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসি-মাখা সুধীর শৈলজার উপরে এমন নির্ম্মম ব্যবহার সহিতে পারিতেছি না!

এই ঘটনার পর হইতে সুধীর ও শৈল আর আমাকে কৃতার্থ করিতে আসে না।

অতৃপ্ত-হৃদয়খানি লইয়া প্রতিদিনই আমি তাহাদের আসার পথ চাহিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা একবারও দেখা দেয় না। বাছারা না জানি কি বিপদে পড়িয়াছে, খবরটাও পাই না।

সহসা একদিন সন্ধ্যাকালে গোধূলির ম্লান ছায়ার মত মলিনবদনা মলিনবসনা শৈলকে দেখিলাম। শৈল প্রতিবাসিনী কুসুমের সহিত কলসী লইয়া জল আনিতে আসিয়াছে।

শৈল তো আসিয়াছে কিন্তু যে চাঁদ মুখখানি দেখিয়া আমার প্রাণে মধুর স্নিগ্ধতা উছলিয়া উঠিত, আজ যেন সে চাঁদমুখ জ্যোৎস্নাশূন্য হইয়া গিয়াছে! দেখিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

আমি নির্ব্বাত নিষ্কম্প হইয়া শুনিতে লাগিলাম,—শৈল কুসুমকে বলিতেছে—"ভাই, জেঠা মহাশয়ের দুর্ব্বাক্য ও দুর্ব্যবহারে আমি নিজে গৌরব মনে করি; কিন্তু উনি না জানি ওঁর কোমল প্রাণে কতই ব্যথা পেয়েছেন!—সেই সব ভেবে ভেবে কি ওঁর এমন অসুখ হ'ল?—এমন অসুক কেন হ'ল কুসুম? দিনান্তে যদি ওঁকে একবার দেখতে পাই, তাহ'লে জগতের কোন কষ্টেই আমার মন অবসন্ন হয় না।—" উচ্ছ্বসিত অশ্রু শৈলর উজ্জ্বল গণ্ড প্লাবিত করিল; শৈল মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল; আর কোন কথা কহিতে পারিল না।

কুসুম বলিল,—"কাঁদিস না ভাই! মা বলেছেন, কাল সন্ধ্যাবেলা চখের জল ফেলিতে নাই; সুধীর দাদার অসুখ অবিশ্যি ভাল হবে। এ গাঁয়ের সকল লোক তাঁকে আশীর্ব্বাদ কোচ্চে; তাঁর মত ভাল লোক কি আর আছে?"

"কাল সন্ধ্যাবেলায়" চক্ষের জল পড়িলে পাছে স্বামীর অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে শৈল তাড়াতাড়ী চক্ষের জল মুছিয়া আমার পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; শেষে করযোড়ে বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! হে নারায়ণ মধুসূদন! আমার স্বামীর অসুখ আরোগ্য করে দাও; আমি কাল সন্ধ্যাবেলায় কেঁদেছি, তাতে যেন তাঁর কোন অমঙ্গল না হয়।" তার পরে উঠিয়া কুসুমের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কুসুম, আজি সতর দিন তাঁকে দেখি নাই; আমি এই অসুখের সময়ে তাঁর কাছে থাকিলে তিনি, কত আরাম পেতেন! তা' জেঠা মহাশয়ের ভয়ে তিনি আমায় সে বাড়ীতে যেতে মানা করেছেন, কিন্তু আর যে আমি থাকৃতে পারি না—" শৈল আর কিছু বলিতে পারিল না; তার চক্ষের জল আবার উছলিয়া উঠিল। দেখিয়া কুসুম তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল; আমি চাহিয়া রহিলাম।

তার পর?—সে কথা আর কি বলিব! আর দুই তিন দিন পরে কি দেখিলাম?—সেই প্রাতঃসূর্য্যের মত স্নিগ্ধ-তেজস্বী, প্রাতঃসূর্য্যের মত রমণীয়, প্রাতঃসূর্য্যের মত নিষ্কলঙ্ক, পবিত্রকান্তি কিশোর সুধীরকে ব্রাহ্মণযুবকেরা গম্ভীর

হরিধ্বনি সহকারে চিতাশয্যায় শয়ন করাইল; সর্ব্বভূক্ হুতাশন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া সেই কমনীয় বর বপু গ্রাস করিতে লাগিল! উহু! সে দৃশ্য আমি আর দেখিতে পারিলাম না!

আমার ছায়াতলে অই বাঁধা ঘাটে বর্ষীয়ান্ বিপ্রগণের মধ্যবর্ত্তী মহাদেব চট্টোপাধ্যায় গড়াগড়ি দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—"বাপ সুধীর! আমার একমাত্র বংশধর! আমার যুধিষ্ঠির-তুল্য নিষ্পাপ সন্তান! তুমি ফিরিয়া এস; আর আমি পিশাচের মত তোমায় অপমান করিব না—আর আমি রাক্ষসের মত তোমার প্রাণে ব্যথা দিব না!—আমি নরাধম, আমি পশু, আমার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া যাইও না। এস! বাপধন, আমার, সত্যবান্ আমার এস, আমার সাবিত্রী মা শৈলজাকে রাণী সাজাইয়া তোমার বামে বসাইব, বাবা, ফিরিয়া এস!" সহস্র সহানুভূতি সহস্র সান্ত্বনা ছাপাইয়া তাঁহার আর্ত্তনাদ গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

হায়! মানবের সুখ, আশা, অহঙ্কার, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ সবই এত নশ্বর! পলক ফেলিতে সবই ফুরাইয়া যায়?—তবে মানব এত নির্ব্বোধ কেন? তাহা-দের দুদিনের খেলা যদি দু'দণ্ডের মধ্যে এমন করিয়া ফুরাইয়া যায়, তবে তাহারা এত আস্ফালন করে কেন?

তারপরে একদিন দেখিতে পাইলাম,—এই ঘাটে নৌকায় উঠিয়া শৈল তাহার মায়ের সহিত কাশীধামে চলিয়া যাইতেছে। সে যে শৈল, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হয় না।—সেই আদরিণী, আনন্দময়ী প্রভাতের পদ্মফুল কি আজিকার এই দীনা ক্ষীণা, চীর-পরিহিতা, ভূষণ সম্পর্কহীনা, অশ্রুমুখী, যেন জগতের কাঙালিনী—এই কি আমার সেই শৈলজা?

যখন শৈল প্রিয়সখী কুসুমের গলা জড়াইয়া বলিল, "কুসুম! কাশী যাইতেছি বটে, কিন্তু আমার কাশী গয়া, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, হরিদ্বার সবই এই বট-তলায় আছে!" তখন এই কাষ্ঠাবরণ সরাইয়া আমার এই বৃক্ষ-হৃদয় ফাটিয়া যেন শতধা হইবার উপক্রম হইল! আমি মাথা হেলাইয়া, পাতা দোলাইয়া বলিলাম,—"সত্য সত্য, সত্য, শৈল! আমিও তোমার সাক্ষী রহিলাম।"

আর সুধীর ও শৈল ফিরিয়া আসিল না। সেই দুইটী রত্ন হারাইয়া অবধি আমিও জীবনে মরিয়া আছি। যখন তাহাদের স্মৃতি বুকে ঘনাইয়া আসে, তখনই একটু আরাম পাই।

এস পথিক এস! এস শ্রান্ত এস! এস পীড়িত এস! আমার শৈল সুধীরের মিলনতীর্থে একবার বসো; তোমায় স্নেহের ছায়া দিব, পাখীর মধুর গান শুনাইব; কেননা পরসেবা ও প্রীতি-বিতরণ ব্যতীত এ সংসারে শোকাকুল হৃদয়ের অন্য শান্তি নাই।

লেখিকা শ্রীমা—

জাপানের অভ্যুদয়।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে আমরা সামরিক বিভাগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিব। কারণ যদি রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ না বাধিত, তাহা হইলে বোধ হয় অনন্ত অগ্নি আরও কিছু দিন ছাই-চাপা থাকিত। এত প্রবল যোদ্ধা হইয়াও জাপান যে এতদিন আপন বল কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান সম্রাট্ রাজ্যবিস্তারের জন্য পররাজ্য আক্রমণ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি কেবল স্বরাজ্যের উন্নতি ও রক্ষার দিকেই সমধিক লক্ষ্য রাখেন। আরো এক কারণ আছে, রুষিয়ার বিরুদ্ধে এক দিন না এক দিন অনতিবিলম্বে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চিত জানিয়াই এতদিন ধরিয়া গোপনে প্রাণপণে সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন। ১৮৯২ সালে চীনের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাও কেবল রুষিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য। রুষিয়া প্রথমে কোরিয়ায় ও তাহার পর মাঞ্চুরিয়ায় ব্যবসা আরম্ভ করিলেন এবং ঐ সকল স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থান চীনরাজের অধীন, সুতরাং চীনরাজ না নিষেধ করিলে রুষিয়া জাপানের কথা শুনিবেন কেন। জাপান বুঝিল যে রুষ ক্রমশঃ সমগ্র মাঞ্চুরিয়া হস্তগত করিয়া জাপানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে। মাঞ্চুরিয়া হস্তগত হইলে জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রুষিয়াকে রসদের নিমিত্ত ভাবিতে হইবে না এবং রুষসৈন্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। এখন রুষকে তাড়াইতে চীন ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই। জাপান চীনকে পত্র লিখিলেন। চীন জাপানের কথায় কর্ণপাত করিলেন না; রুষিয়া চাহিবার অগ্রেই চীন তাহার অভিলষিত দেশ রুষকে অর্পণ করিলেন, রুষিয়াও জাপানের নিষেধবাক্য শুনিলেন না। সুতরাং কৌশলে চীনের বলহ্রাস না করিলে জাপান আত্মরক্ষার্থে সমর্থ হইবে না দেখিয়া, চীনের বিরুদ্ধে সকল প্রধান প্রধান মাকি একত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়া চীনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া স্বাধীন হইল। লঙ্কা ভাগ হইল; রুষিয়ার ভাগে পোর্ট আর্থার পড়িল। জাপান দেখিল যে, পোর্ট আর্থারই তাহার ভীতির কারণ। এই স্থান হইতেই রুষিয়া নিজ মতলব সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। এই সময় হইতে জাপান সমরবিভাগে ক্রমশঃ সৈন্য ও গোলাগুলি প্রভৃতি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কারণ, তাহারা বেশ বুঝিল যে, এখন ভল্লুক বনছাড়া হয় নাই। ক্রমশঃ রুষিয়া মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। জাপান দেখিল আর অপেক্ষা করা চলে না, এবং তাহাদের সমর-উদ্যোগও বড় কম হয় নাই। তাই তাহারা

আত্মরক্ষার্থে রণে মত্ত হইল। এই দূরদর্শী রাজার ও রাজমন্ত্রিগণের সৈন্য কিরূপে এত রণকুশল হইল ও অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান সম্রাটের পূর্ব্বে সামরিক বিভাগে সম্রাটের কোন হাত ছিল না। সম্রাট্ রাজকার্য্য লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাট্ সে প্রকারের নন। পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌসেনা প্রভৃতি সকল বিষয়েই রাজা নেতা এবং সম্যক্ পরিদর্শন করেন। তিনি যে কেবল রাজা বলিয়া সেনাদিগের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব, তাহা নহে। তিনি বাস্তবিকই একজন প্রধান রণকুশল সেনাধিনায়ক। যখনি দেশে সৈন্যদিগের রণকৌশল প্রদর্শন জন্য (Field manoevoures) বড় রকম আয়োজন হয়, তখনি রাজা স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যদিগের গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহিগণের মধ্যে স্বয়ং সম্রাট্ একজন। দেশে যাহাতে ভাল ভাল অশ্ব জন্মাইতে পায় ও তাঁহার প্রজাগণ যাহাতে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হয়, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। নেগিমি নামক স্থানে ঘোড়দৌড় হইয়া থাকে এবং সম্রাট্ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। ইহা যে কেবল আমোদ উপভোগের জন্য, তাহা নহে; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যে যাহাতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্ব জন্মায় ও ভাল ঘোড়সওয়ার হয়। যদিও রাজা সৈন্যবিভাগে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন ও সমধিক উৎসাহ প্রদান করেন, তথাপি সামরিক বিভাগে অতিশয় খ্যাতিলাভ করিবেন, এ প্রকার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আদৌ নাই। যাহা করা উচিত বিবেচনা করেন, তিনি তাহাই প্রাণপণে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, নিজে যশস্বী হইব, তিনি এরূপ আকাঙ্ক্ষার ধার ধারেন না। ভারতবর্ষে যেরূপ বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে অতি উপযুক্ত লোক থাকিলেও সৈন্যবিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারে না, জাপানে সেরূপ নহে। প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা জাপানের সকল শ্রেণী হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইয়া সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। উপযুক্ত লোক হইলেই হইল, যে গ্রাম বা জেলা বা বিভাগ হইতেই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। Satsuma Class ও Choshu Clan প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক আছে। বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়া বলবান্ লোককে সৈন্য নিয়োগ করা হয়। অন্য দেশে অধিকাংশ স্থলে কেবল সাহস ও বলই দেখিয়া থাকে, বুদ্ধির দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখে না। জাপানে শতকরা ৯০ জন সৈন্য লেখাপড়া জানে। জাপানী গবর্ণমেণ্টের ন্যায়পরায়ণতা ও অপক্ষপাতিত্ব ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাই সামরিক বিভাগের উন্নতির প্রধান কারণ। রাজাই প্রজার প্রাণ, সুতরাং তাঁহার জন্য, তাঁহার সুখের জন্য প্রজা প্রাণ দিবে না কেন?

"I love you what is that to you" জাপানীদিগের রাজভক্তি এইরূপ। জাপানীসেনা যখন বীরদর্পে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়, তখন তাহারা স্বদেশরক্ষার্থে বা রাজার রাজ্যরক্ষার্থে, কোনটীকে মনোমধ্যে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রাণ দিতে রাজি হয়, বলা কঠিন। কারণ, জাপানে দেশরক্ষা অর্থে রাজার প্রাণরক্ষা, রাজার মানরক্ষা, রাজ্যরক্ষা। তাহারা ভাবে,—এমন রাজা হারাইলে তাহারা একটী অসময়ের প্রকৃত বন্ধু হারাইবে, একটী আশ্রয়দাতা হারাইবে, ও চির দিনের মত তাহাদের জীবনের সুখশান্তি হারাইবে; এ রাজার জন্য যদি না তাহারা প্রাণ দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরকগামী হইতে হইবে। জাপানী সেনার মত শিক্ষিত সেনা আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। রুষিয়ার শতকরা ২০ জন সৈন্য লেখা পড়া জানে কিনা সন্দেহ। ভারতের সেনার মধ্যে শিক প্রভৃতির মধ্যে অতি অল্প সেনাই লেখাপড়া জানে। সম্রাট্ সৈন্যদিগকে কিরূপে উৎসাহ দিয়া থাকেন এ সম্বন্ধে আরো দুই এক কথা বলিব। জাপানে রাজবাটীর সীমার মধ্যে দুইটী Museum সম্রাট্ নিজে প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইহা সাধারণের জন্য খোলা থাকে না বটে, কিন্তু রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও স্কুলের ছাত্রগণের জন্য অবারিতদ্বার। এই Museum-এ Chino-Japanese যুদ্ধের ও পিকিন অভিযানের গৌরবসূচক স্মরণচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা সৈন্যদিগের সাহস ও প্রাণপণ যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, এরূপ অনেক দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে; যেমন শত্রু-গোলার দ্বারা ছিন্নভিন্ন সেনাবিভাগের পতাকা (regimental flag) এবং যে সকল সৈন্য বা অন্য লোক স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি।

জাপানী সম্রাটের উৎসাহ প্রদান কম কোন্ দিকে! শিল্প ও শিক্ষা বিষয়েও সেইরূপ। তিনি সকল প্রকার শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদান করেন, এবং রাজধানীতে ও অন্যান্য স্থানে নিয়মমত সময়ে সময়ে প্রদর্শনী হইয়া থাকে। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী এই সকল প্রদর্শনী দর্শন করিতে যান; এবং তাঁহারা পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিতে প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য যে, গৃহে কতকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করা তাহা নহে; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য শিল্পকার্য্যে উৎসাহ প্রদান। এক্ষণে শিল্প সম্বন্ধে আমরা একটু বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব। কারণ জাপানের শিল্প ও রণনিপুণতা সকলই উপযুক্ত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাপানে শিক্ষা—

৩০০ খ্রীঃ অঃ প্রথমে চীনভাষা জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়। ইতিপূর্ব্বে দেশে লেখা পড়া ছিল না, এ কথা যদিও বলা যায় না, কিন্তু ছিল বলিয়াও কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৫০০ খ্রীঃ অঃ লেখা পড়া এরূপভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে,

তখনকার জাপানী সম্রাট্ তাঁহার অধনীস্থ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গবর্ণমেণ্টের record রাখিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে জাপানে শিক্ষা শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ৬৬৪ খ্রীঃ অঃ গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, এবং ঐ বৎসরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও ভদ্রলোকদিগের জন্য কীয়টো নগরে কতকগুলি বিদ্যালয় ও একটী Central University সংস্থাপিত হয়। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক Province বা বিভাগে এইরূপ কলেজ স্থাপনা করা হয়; এবং স্কুলের নামে অনেক অর্থ দান ও ছাত্রদিগের ভরণপোষণের জন্য একটী বন্দোবস্ত করা হয়। ইতিহাস, কম্পোজিসন, অঙ্ক, আইন, চিঠিপত্রাদি লেখা প্রভৃতি স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং এ সময়েও ছাত্রদিগের শারীরিক পরিশ্রমের উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ শিক্ষার উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পর হইতে দেশে নানা রাজাবিপ্লব ও গৃহবিবাদ হওয়ায় প্রায় দুই শত বৎসর কাল শিক্ষার উন্নতি কমিয়া গিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দেশে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইলে সকলে পুনরায় লেখা পড়ার দিকে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। এ সময় প্রায় প্রতি Province-এ Government College স্থাপিত হয় ও গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখেন। এই ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ১৮৬৭ সালের যে সময়ে বর্ত্তমান সম্রাট সিংহাসন প্রাপ্ত হন, সেই সময়েই শিক্ষার তত্ত্বাবধারনার্থ পৃথক্ একটী "শিক্ষাবিভাগ" (Department of education) খোলা হয়। এ সময়ে যে Imperial Rescript প্রচারিত হয়, তাহাতে লেখা পড়ার উন্নতিকল্পে যাহা লিখিত আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই—"The acquirement of knowledge is essential to a successful life. All knowledge is acquired by learning. A long time has elapsed since schools were first established, but amongst farmers, artisans and merchants and also amongst women, learning has frequently been regarded as superfluous, and even among the higher classes much time has been spent in writing poetry and composing maxims, which might have been better spent in learning what would have been of benefit to the individual or to the state. It is desired henceforth that education shall be so defused that there may not be a village with an ignorant family nor a family with an ignorant member."

"জ্ঞান লাভ না হইলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা সকল জ্ঞানই উপার্জ্জন করা যায়। যদিও বহু দিন হইল স্কুল কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি কৃষক, মিস্ত্রী, ব্যবসায়ী, ও স্ত্রী-লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা অনাবশ্যক বলিয়া লোকে মনে করিয়া আসিতেছে এবং উচ্চ শ্রেণীর লোক সকল তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যক্তিগত বা রাজ্যের উপকারে নিয়োজিত না করিয়া কেবলমাত্র পদ্য ও নীতিরচনায় অনর্থক মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতেছেন। অতএব এই সময় হইতে এরূপভাবে শিক্ষার বিস্তার হওয়া আবশ্যক যে, কোন পল্লীতে একটীও মূর্খ গৃহস্থ না থাকে, এবং কোন গৃহে যেন একটীও মূর্খ লোক না থাকে।" যে দেশে সম্রাট্ এরূপ ভাবে মনোনিবেশ করেন, সে দেশে শিক্ষাবিস্তার হইতে কত দিন লাগে? আমাদের দেশের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। অনেকে বলেন যে, গরীবকে লেখা পড়া শিখিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাদের মূর্খ থাকাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু জাপানের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়, কেননা "ফলেন পরিচীয়তে।"

১৮৭২ খ্রীঃ অঃ শিক্ষা সম্বন্ধে জাপানে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে প্রত্যেক জাপানীকে তাহার সন্তানদিগকে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হয়; এবং যতদিন না তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, ততদিন পর্য্যন্ত কেহ বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারে না। ১৮৯০ অব্দে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং সম্রাট্ বক্তৃতায় বলেন যে, সাম্রাজ্যের স্থিতি ও উন্নতির জন্য রাজভক্তি ও নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণতা যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞানোপার্জ্জন ও বুদ্ধি বৃত্তির পুষ্টিসাধনও তদনুরূপ আবশ্যক। সেই জন্য সাধারণকে উপদেশ দেন যে, "লেখা-পড়ার দ্বারা চরিত্র গঠন কর, জ্ঞান উপার্জ্জন কর, গবর্ণমেণ্টকে মান্য কর, আইনের বশবর্ত্তী হও, এবং জাতীর মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন কর।" এই বক্তৃতার নকল সমস্ত পল্লীতে ও দেশের সমস্ত স্কুলে বিতরিত হইল; এবং অধিকাংশ ছাত্রকে তাহাদের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হইল। এইরূপে বাল্যকাল হইতেই ছাত্রগণ স্বদেশহিতৈষী হইতে শিক্ষা পায়; এই অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফল পুষ্পে বিমণ্ডিত হইয়া পরোপকারে নিয়োজিত হয়।

(ক্রমশঃ)

গৃহচিকিৎসা—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বাতবেদনা—বাতবেদনা যে কোনও স্থানে হউক, রশুন, মুসব্বর, আদা, কৈওকড়া, এই তিন দ্রব্য সমভাগে একসঙ্গে বাটিয়া, গরম করিয়া, বেদনা-স্থানে প্রলেপ দিবে। দিনে দুই তিন বার প্রলেপ দিবে।

২। অম্লশূল—ঝুনা নারিকেলের মুখ কাটিয়া জল ফেলিয়া, তন্মধ্যে যমানী (যোয়ান) এক ছটাক, পঞ্চ লবণ অর্থাৎ সৈন্ধব, বিট্ বা কালো নুণ, কর্কচ নুণ, সচল নুণ, (অভাবে পাঙ্গানুণ,) এবং সাম্বর নুণ (যাহা দেখিতে লালবর্ণ), প্রত্যেক এক তোলা করিয়া, এবং কলি-চূণ এক ছটাক পূরিয়া নারিকেলের মুখে ছিপি বন্ধ করিয়া, সমস্ত নারিকেলে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। উহা শুকাইলে, দুই হাত পরিমাণ গভীর ও প্রশস্ত গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ বিলঘুটে দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তদুপরি ঐ মৃত্তিকালিপ্ত নারিকেলটী রাখিয়া, তদুপরি বিলঘুটে দিয়া সমস্ত গর্ত্তটা পূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ তদুপরি দুই এক খান ঘুটে আগুনে ধরাইয়া রাখিবে। ক্রমে সমস্ত ঘুটে পুড়িয়া শীতল হইয়া গেলে, নারিকেলটী তুলিয়া লইবে। নারিকেলের দগ্ধ মালা ভিন্ন সমস্ত অংশ শিলে পেষণ করিয়া শিশিতে ভরিয়া উত্তমরূপে ছিপি দিয়া রাখিবে, না হইলে উহা গলিয়া জল হইয়া যাইবে। এই ঔষধ ৴০ এক আনা হইতে ৵০ দুই আনা (যেরূপ সহ্য হয়) শীতল জল দিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিবে।

৩। দদ্রুরোগ—গন্ধক, সোহাগার খৈ, শ্বেতধুনা, রুমিমস্তকী এই চারি দ্রব্য গব্য ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

৪। কুষ্ঠ ও বাতরক্ত—একটী বড় ও পুরাতন নিমগাছের গায়ে গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে কতকগুলি ছোলা রাখিয়া, গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। ১৫ দিন পরে ঐ ছোলা বাহির করিয়া প্রত্যহ প্রাতে একটী করিয়া ছোলা খাইবে। এক সপ্তাহেই বিশেষ উপকার দর্শিবে। দেড় মাস কাল খাইতে হইবে।

৫। দন্তশূল—হিঙ্ ঘৃতে ভাজিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া দন্তের বেদনা-স্থানে লাগাইবে। ক্রমে লালা নিঃসৃত হইয়া বেদনা কমিবে। তৎপরে গরম জল দিয়া মুখ ধুইবে।

৬। চক্ষু ওঠা—হাতিশুঁড়ের পাতার রস বা তেলাকুচা পাতার রস চক্ষে দিলে, যাতনার সহিত রক্তিমতা দূর হইবে।

৭। বমি—ইক্ষুচিনির সরবতের সহিত ১০।১২টী কচি আমপাতা রগড়াইয়া, ছাঁকিয়া ঐ সরবত খাইলে বমি নিবারণ হয়।

৮। টাকের ঔষধ—কাঁচা দুগ্ধের গাঁজলা (ফেনা) চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া টাকে মালিস করিলে শীঘ্রই চুল উঠিবে।

৯। অম্লপিত্ত ও শূল—পুরাতন তেঁতুল গাছের ছাল ভস্ম করিয়া, তাহার ৩ রতি প্রমাণ এক একটী বটিকা করিয়া, সেই বটিকায় শুষ্ক কলি চূণের আবরণ দিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শীতল জল সহ সেবন করিবে। শূল প্রবল হইলে চূণের জল সহ একটী বটিকা সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ শূলের উপশম হইবে।

১০। বালকের দুধতোলা ও উদরাময়—আপাঙের শিকড় অতি অল্প মাত্রায় দুগ্ধ সহ বাটিয়া খাওয়াইলে শীঘ্র বিশেষ উপকার হইবে।

নূতন সংবাদ।

১। রেলপথে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি চুরি ও নানা বিপৎপাতে যাত্রীদিগের রেলপথে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে ভ্রমণ করা আশঙ্কার বিষয় হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন হইতে রাত্রিকালে প্রত্যেক ট্রেণে একজন অতিরিক্ত গার্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রত্যেক ষ্টেসনে নামিয়া যাত্রীদিগের সুবিধা অসুবিধা ও তাঁহাদের জিনিষ পত্রাদির তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

২। টেলিগ্রাফ আফিসে কতকগুলি নূতন নিয়ম হইবার প্রস্তাব হইতেছে। চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম আর থাকিবে না। এখন হইতে দুই রকম টেলিগ্রামই চলিবে। অর্ডিনারি ছয় আনা এবং আর্জেণ্ট বার আনা।

৩। বিলাতে পুরুষদিগের সমান অধিকার পাইবার জন্য ইংরাজ-মহিলারা তাহাদের নিজ মত ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সভা করিতেছেন এবং মন্ত্রিসভায় বক্তৃতা করিতেছেন। সম্প্রতি পার্লামেণ্ট সভায় অনেকগুলি মহিলা আপনাদের অধিকার লাভের দাবী করিতেছিলেন। পুলীশ তাঁহাদের দলপতিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, এবং অনেকগুলি মহিলাকে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

৪। ১২ই নবেম্বর হইতে নাগপুরের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম নাগপুরেই শিল্পপ্রদর্শনী হয়। ইহার পর ভারতে নানা স্থানে নানা প্রকার প্রদর্শনী হইয়াছে। এই নাগপুর-প্রদর্শনীতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে শিল্পের যে অবস্থা ছিল এবং এক্ষণে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

৫। কুচবিহারের মহারাজা কুচবিহারে একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করিতেছেন। ইহার পরিচালনের জন্য স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

৬। পঞ্জাবের মুক্তিফৌজ মিসনের পাদরী সাহেবদিগের তত্ত্বাবধানে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে বস্ত্রবয়ন-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য একটী বৈজ্ঞানিক বস্ত্র-বয়ন-শালা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পঞ্জাবের ছোট লাট অমৃতসরে এই বস্ত্র-বয়নশালার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৭। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ সারদা চরণ মিত্র মহাশয় শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন শুনা যায়। বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া শীঘ্রই বিচারকার্য্য গ্রহণ করিবেন।

৮। বিলাতে অনেকগুলি কল বন্ধ

হওয়ায় বেকার লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা কার্য্যাভাবে যার পর নাই বিপন্ন হইয়া অবশেষে দাঙ্গা-হাঙ্গাম এবং লুট পর্য্যন্ত করিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট অধুনা তাহাদিগকে নৌ-বিভাগে ও অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আগামী বৎসরে তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৯। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কোনও কালে ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্ভাব ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সেখানে ভীষণভাবে ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্ভাব হইয়াছে। কাণপুর, লাহোর, বেনারস প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ায় অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে।

১০। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য প্রদেশের শিল্পোন্নতির জন্য একজন ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডষ্ট্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকার শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা প্রদান করিবেন।

১১। বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের ২রা তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ঐ দিনে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারের পর হইতে ভারতবাসী এবং করদ ও মিত্ররাজগণ কিরূপ সুখস্বচ্ছন্দে আছেন, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কতকগুলি বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

১২। বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের ৭ই তারিখে কলিকাতা ওভারটুন হলে একটী বালক ছোটলাট বাহাদুরের প্রাণনাশের চেষ্টায় বন্দুক ছুড়িয়াছিল. কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই। বালক এক্ষণে বিচারাধীন আছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

চিন্তা-নির্ঝরিণী।—শ্রীযুক্ত কুমারবিক্রম মজুমদার প্রণীত নূতন ধরণের পুস্তক। পুস্তকের নাম এবং প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার গভীর চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধনিচয়ের সুন্দর ভাব এবং রচনালালিত্যে পাঠকের মনে এক অপূর্ব্ব গভীর ভাবের উদ্রেক হয়। পুস্তকের অবতারণা যেমন মধুর, পরিসমাপ্তিও সেইরূপ।

বামারচনা।

আবাহন।

ডাকিতেছি সকাতরে
দীনা অভাগিনী আমি।
এসো এসো শূন্য হৃদে
হে করুণাময় স্বামী।

শূন্য রাখিও না নাথ!
এ হৃদয় সুধালয়;
শুনিয়াছি শূন্য গেহ
হয় ক্রমে দৈত্যালয়।

এ নীরস ধরাতলে
শান্তি যে মিলে না আর;
ভীষণ আঁধারে প্রভো!
ভরেছে হৃদয়াগার।

এসো নাথ! এসো এসো
শূন্য এ হৃদয়ে মোর;
দুর্বহ এ জীবন
বহিতে পারিনে আর?

দাও শক্তি দাও বল,
মুছে দাও অশ্রুজল;
নিভাও যাতনারাশি
এ শোকার্ত্ত চিতানল।

সংসার-সৈকতে আমি
কেমনে রহিব একা,
এসো নাথ! শূন্য হৃদে
হ'য়ে নব হৃদিসখা।

"আসন" রেখেছি পেতে
শূন্য এ হৃদয়-কূপে;
এসো ওগো বিশ্বপতি!
প্রেম মৃত্যুঞ্জয় রূপে।

মহাযাত্রা।

১

যুগল বরষ পূর্ণ? সম্ভব কি হয়?
একা আমি লুটিতেছি শ্মশানের গায়।
গৃহদীপ নির্ব্বাপিত, জ্ঞান ধর্ম্ম তিরোহিত,
ভীষণ ছায়া শমন তমসা ছড়ায়;
সত্যই কি দুই বর্ষ ছেড়েছ সবায়?

২

যুগল বরষ গত—সম্ভব কি হয়?
ফেলিয়া গিয়াছ সবে নির্ম্মম ধরায়?
সেই যে অমৃতবাণী, না জাগায় এ ধমনী,
সে শুভ্র মূরতি লুপ্ত ভীষণ চিতায়;
সত্যই কি দুই বর্ষ হেরি না তোমায়?

৩

সত্যই কি দুই বর্ষ, না হেরি তোমায়;
জীবনের নিত্য গতি ফিরিছে কোথায়?
ভাবিতে পারিনা হায়! তুমি নাই এ ধরায়,
একা আমি আছি বেঁচে শ্মশান-ধরায়,
দুই বর্ষ একা বেঁচে? বিশ্বাস না হয়।

৪

দুই বর্ষ কেটে গেল এ অমা নিশায়,
এ শ্মশানে কে রাখিল এই অনাথায়?
বিশ্বাস সে ধর্ম্মবল, সব গেছে রসাতল,
মধ্যাহ্নে রাহুর গ্রাসে তপন লুকায়;
সত্যই কি দুই বর্ষ মিশেছ চিতায়?

৫

সত্যই কি দুই বর্ষ মিশেছ চিতায়?
আনন্দ-আশার প্রভা বিলীন ধরায়?
এতকাল লুটিতেছি সব আশা হারায়েছি,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গেছে মহা তমসায়।
শ্মশানের বহ্নি ব্যাপ্ত শ্যামলা ধরায়।

৬

যুগল বরষ পূর্ণ সম্ভব কি হয়!
এ সুরম্য স্থান তব ভরা তমসায়।
তরুতলে, গৃহকোণে বিধির আশীষগুণে,
কতই স্মরণসুধা ঢেলেছ তথায়;
দুই বর্ষ আর আলো জ্বলে না ধরায়।

৭

দুই বর্ষ পূর্ণ আজি—সম্ভব কি হয়,
সহিতেছি একা এই কালের প্রলয় ;
সেই আমি ভীরু প্রাণী, শমন অশনি হানি
নাশিল জীবনধারা মরুতে মিশাতে ;
দুই বর্ষ লুটিতেছি শ্মশানের গায় ?

৮

যুগল বরষ আগে কত আশা লয়ে
ভাবিতাম শমনেরে দিব তাড়াইয়ে,
পৃথিবীর শক্তি যত ভাবিতাম নিজ হাত,
সেই শক্তি সেবা যত্ন একত্র করিয়া
ভাবিতাম শমনেরে দিব তাড়াইয়া।

৯

যুগল বরষ পূর্ণ ভেঙ্গেছে সে ভুল,
আঁধারে ডুবিয়া সদা পরাণ আকুল ;
সে কর্ম্মের কোলাহল, সেই ব্রহ্মশক্তিবল,
দেখালে জলন্ত ভাবে তবু মম ভুল—
মহা ভুল, অনুতাপে পরাণ আকুল।

১০

যুগল বরষ পূর্ণ বসন্ত না আসে,
এ শ্মশানে লুটিতেছি অনাথার বেশে।
সেই যে ধর্ম্মের কল নিশি দিবা প্রজ্বলিত,
সেই গৌরবেতে আজো চিত্ত বিমোহিত।
সেই পুণ্য এ সংসারে নহে তিরোহিত।

১১

না না তুমি হেথা নাই ভাবিলেও পাপ ;
সহিবারে দাও বল—যত শোক তাপ।
বিধির আশীষ পেয়ে পুণ্য বিভা বিতরিয়ে,
অমর ধামেতে আছ স্বকার্য্য সাধিয়া,
আমি যে অতীব মূঢ় যাই তা ভুলিয়া।

১২

কি সাধ্য কালের তব ও প্রভা মুছায় ?
পুণ্য গাথা চিরাঙ্কিত রবে এ ধরায়।
যে বিধান বিধাতার রোধে তাহা সাধ্য কার?
মৃত প্রাণে দাও বল এ অমানিশায়,
জীবন বহিছে শুধু ও পুণ্যপ্রভায়।

Fairy Hall.

ভাইফোঁটা।

আজি কেন উদ্ভাসিত
নব প্রেমে এ ধরণী ?
কি কুটীরে কি প্রসাদে
উঠেছে আনন্দধ্বনি।

মঙ্গল-কল্যাণ-গীতি
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে,
ভগিনী পরাবে ফোঁটা
ভায়েরে হরষভরে।

ভারতের এই দিন
সুপবিত্র, নিরমল,
ভাই বোনে এই ভাব
থাক চির-অচঞ্চল।

সীমা ছাড়ি, গণ্ডী ছাড়ি,
জাতীয় জীবন সাথে,
ছুটুক অনন্ত মুখে
এ প্রেম, অনন্ত পথে।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 544. December, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৪ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। ডিসেম্বর, ১৯০৮। | ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন ছোট লাট—বঙ্গের ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সার এডওয়ার্ড বেকার তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

মৃত্যু—৺ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র পঞ্জাবের একাউণ্টাণ্ট-জেনারল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য ৩রা অগ্রহায়ণ, বুধবার, লাহোরে, ৪৫ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এই উচ্চ পদে তিনিই প্রথম অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তিদান করুন।

চীনের সম্রাট্ সান্‌টিন্ কংহসু গত ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধা রাজমাতা অনেক দিন হইতেই পীড়িতা ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুসংবাদের দুই দিন পরেই শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রাজপুত্র চুন স্বীয় দুই বৎসরের পুত্র পুইকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ছোট লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা—কলিকাতা ওভারটুন হলে বক্তৃতার সময় একটী যুবক বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িয়াছিল, কিন্তু বন্দুক খারাপ থাকায় গুলি বাহির হয় নাই, এবং আসামী গ্রেপ্তার হইয়া দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের সভাপতি—শুনা যায় মাননীয় ডাক্তার রাসবেহারী ঘোষ মহাশয় আগামী জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

বিহারে অশান্তি—শুনা যায়, বিহারে অনেক প্রজা নীলের চাষ পরিত্যাগ করিয়া ইক্ষুর চাষে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং

অনেকে আর নীলকরদের কার্য্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক প্রজাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি—ভারতে দেবোত্তর সম্পত্তি নামে দেবসেবা, অতিথি-সেবা ও শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সে সকল টাকার সদ্ব্যবহার না করিয়া অশিক্ষিত লোকেরা নিজেরা ব্যয় করিয়া থাকেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এই সকল দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষার জন্য এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে সুব্যবস্থা—আয়র্লণ্ডের ইংরাজ জমিদার এবং আইরিস প্রজাদিগের মধ্যে প্রায় অশান্তি ও গোলযোগ বাধে। গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য আইন করিয়া ইংরাজ জমিদারদিগকে বাধ্য করিয়া আইরিসদিগের নিকট তাহাদের জমিদারী বিক্রয় করাইতেছেন।

প্রতিবাদ সভা—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য টাউনহলে ভারতের সকল সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক বিরাট সভা করিয়াছিলেন। ভূপালের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মৌলভি আব্দুল জব্বর সিমনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দান—বাবু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের স্মরণার্থ এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে একটী রোগীর বাসের জন্য ৩০৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

তুলসী নিজ পত্নীকে আপন ভবসাগর-পারের সহায় ও প্রথম গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতেন, কেননা, প্রথমে পত্নীর ভর্ৎসনায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হয়। পত্নীর সেই তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য তীক্ষ্ণধার কুঠারের ন্যায় তাঁহার মায়া-তরুর মূলে পতিত হইয়াছিল। তিনি সে কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন এবং পত্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। পতির সন্ন্যাসগ্রহণের পর তুলসীপত্নী অনুতাপে ও শোকে জীবন্মৃতা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক দেহপাত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সন্ন্যাসগ্রহণের বহুদিন পরে, তুলসী ঘটনাক্রমে শ্বশুরালয়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পত্নী দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দেহ এরূপ শীর্ণ হইয়াছিল যে, তুলসী প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। পরে তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র দান করেন। তুলসীপত্নী তদবধি অপূর্ব্ব

শান্তিময় নব জীবন লাভ করিয়া অবশিষ্ট জীবন পরানন্দে অতিবাহিত করিয়া ছিলেন।

বজ্রলেপঘটিত সুদৃঢ় মায়া-পাশ ছেদন করিয়া, অটল গিরিরাজের ন্যায় কৈবল্য-পথে দণ্ডায়মান হইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তুলসী গৃহত্যাগ করেন। তিনি সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন, সংশয় নাই। সে সময় তিনি আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তুলসী যব্ জগমে আয়ো, জগ হসে তোম্ রোয়্।
আইসে কর্নি কর্ চালাকি, তোম্ হসো জগো রোয়॥"

—হে তুলসী! তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে (মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে), তখন (সূতিকাগৃহে তোমাকে দেখিয়া) সকলে (আনন্দে) হাসিয়াছিল, কিন্তু তুমি রোদন করিয়াছিলে। এখন তুমি এমন কার্য্য করিয়া যাও যে, (তোমার প্রস্থানকালে) সকলে রোদন করে, আর তুমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পার।

সত্য সত্যই তুলসী জগৎকে কাঁদাইয়া, স্বয়ং পরমানন্দে আনন্দধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বিশ্ববাসীর চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে যিনি নিত্য জাগরূক, তিনিই জীবিত, তিনিই অমর।

উল্লিখিত হইয়াছে, হনুমান্ তুলসীকে বলিয়াছিলেন—তোমার ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে তুমি বারংবার ভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিবে। হনুমানের সে আশ্বাস-বাণী সফল হইয়াছিল। সাধনার প্রথমাবস্থায় তুলসী বহুদিন রমণীয় চিত্রকূটে বাস করিয়াছিলেন। একদা তত্রত্য মন্দাকিনী নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া, তিনি চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন ও মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক অপূর্ব্ব শ্যামমূর্ত্তি শিশু তথায় উপস্থিত হইয়া অমৃতায়মান কণ্ঠে কহিল,—বাবাজি! আমি আপনাকে চন্দন মাখাইতেছি। তুলসী কহিলেন,—আচ্ছা। শিশু পরম যত্নে তুলসীকে চন্দন মাখাইতে লাগিলেন। সেই শিশু যে ছদ্মরূপী স্বয়ং রামচন্দ্র, তুলসী তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কেননা সে করকমলের স্পর্শমাত্রই কি এক অপূর্ব্ব আনন্দনির্ভরে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিমূঢ় হওয়ায় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। হনুমান্ অলক্ষ্যভাবে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ সময় উঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, এ অবসর চলিয়া গেলে, হয়ত আর ঘটিবে না। হনুমান্ তখন শুক-পক্ষীর রূপ ধারন করিয়া সমীপস্থ বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুবাক্য স্বরে কহিলেন,—

"চিত্রকূটকে ঘাটপর ভূই সন্তনকী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে, তিলক দেত রঘুবীর॥"

—অহো! আজি চিত্রকূটের ঘাটে, ভক্তসন্তানের কি শুভদিন! তুলসীদাস চন্দন ঘষিতেছেন, রঘুবীর তাঁহাকে চন্দনের তিলক দিতেছেন!

হনুমান দুই তিন বার ঐ শ্লোক পাঠ করিলে, তুলসীর চৈতন্য হইল। তিনি

জানিলেন,—ইনিই রামচন্দ্র। তখন তিনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া ভগবানের চরণে পতিত হইয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। তখন হনুমান্ তুলসীর নিকট আসিয়া কহিলেন,—হে ভক্ত সাধো! ভগবান্ তোমার ভক্তি-ডোরে বদ্ধ হইয়াছেন. তুমি বার বার তাঁহার দর্শন পাইবে. এবং আমিও প্রয়োজনমত আসিয়া তোমার সহায়তা করিব।

তুলসীদাস একদা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে আশ্রম হইতে বহুদূর গমন করিলেন। বনপথ দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে দেখিলেন,—অদ্ভুতমূর্ত্তি অসংখ্য বানর ও রাক্ষস সমবেত। তথায় মহাসমারোহে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক মহোৎসব হইতেছে। তিনি অবাক্ হইয়া ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—তত্রত্য লোক সকল সমবেত হইয়া আশ্চর্য্য বেশভূষা করিয়া এ স্থানে রামলীলা করিতেছে। অহো! কি আশ্চর্য্য অভিনয়! অভিনয় এত সত্য, এত অবিকল হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। তিনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কহিলেন;—অহো! কি আশ্চর্য্য রামলীলা দেখিলাম! আপনি কি এ রামলীলা দেখিয়া আসিলেন? ব্রাহ্মণটী বিস্মিত হইয়া কহিলেন;—গোঁসাইজি! আপনি দেখিতেছি, ক্ষেপিয়াছেন। রামলীলা আশ্বিন মাসে হয়, এসময় রামলীলা কোথায়? তুলসী কোনও উত্তর না করিয়া, হনুমানের বাক্য ও ভগবানের অচিন্ত্য লীলারহস্য ভাবিতে ভাবিতে, চিত্রকূট হইতে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন।

তুলসী যে সকল খাদ্যাদি উপহার পাইতেন, তাহা অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দরিদ্রগণকে দান করিতেন। যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পরদিনের জন্য রক্ষা করিতেন। ৺কাশীধামে চৌরের ভয়ানক উপদ্রব। একদিন গভীর অন্ধকাররাত্রে তাঁহার আশ্রমে চৌর আসিয়াছিল। চৌর তাঁহার গৃহমধ্যে যেই প্রবেশ করিবে, অমনি সম্মুখে দেখিল,—এক তেজঃপুঞ্জ অপূর্ব্ব শ্যামবর্ণ পুরুষ ভীষণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান! তদ্দর্শনে সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া, "রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!" বলিয়া তুলসীকে আহ্বান করিতে লাগিল। তুলসী তাহার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া চৌরকে অভয় দিয়া, এবং পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া, বিদায় দিলেন। অনন্তর মনে মনে ভাবিলেন,—অহো! আমি কি মূঢ়! আমি এই তুচ্ছ দ্রব্যের জন্য প্রভুকে এত ক্লেশ দিতেছি! তদবধি তিনি ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যই পর দিনের জন্য সঞ্চিত রাখিতেন না, প্রত্যহ সমস্তই দান করিয়া ফেলিতেন।

আর একদিন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে তুলসী একাকী কাশীর এক গলি দিয়া আশ্রমে আসিতেছিলেন। এমন সময়ে ভীষণ দস্যুদল তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল,

তাঁহার প্রাণবধের জন্য অস্ত্র তুলিল। তুলসী একান্তভাবে হনূমান্‌কে স্মরণ করিলেন। পরক্ষণেই দস্যুগণের হস্তপদাদি অস্পন্দ হইল, মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। তাহারা কাতরভাবে প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। তুলসী বলিলেন—যদি তোমরা শপথ করিয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর, তবে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা তাহা স্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। তদবধি তাহারা দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া সাধু জীবিকা অবলম্বন করিল।

তুলসী পরোপকারের সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। তাঁহার যত্নে অসংখ্য দীনহীন অনাথের দুঃখমোচন হইয়াছিল। কোনও প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে হিন্দু, মুসলমান সকলেই তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। ইহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

একদা তিনি জনকপুরে গিয়া শুনিলেন, পাটনার মুসলমান সুবাদার এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বারখানি গ্রাম বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ সপরিবার অন্নাভাবে ঘোর দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে। উক্ত বারখানি গ্রাম, ঐ ব্রাহ্মণেরা রামচন্দ্রের রাজত্বকাল হইতে ব্রহ্মত্ররূপে ভোগ করিয়া আসিতেছে। ঐ ব্রাহ্মণেরা তুলসীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া, সপরিবারে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তুলসী সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলে, সুবাদার সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তুলসী তাহাকে পার্থিব বৈভবের অসারতা ও অধর্ম্মাচরণের ভীষণ পরিণাম এরূপ মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বুঝাইলেন যে, সুবাদার ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, তাহার পৈতৃক সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল।

জাহাঙ্গীর বাদসাহ পিতার নিকট এবং অন্যান্য লোকের নিকট তুলসীর অলৌকিক প্রভাব অবগত হইয়াছিলেন। তিনি তুলসীকে দেখিবার জন্য এরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, স্বয়ং কাশীধামে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে প্রভূত সম্পত্তি দিতে চাহিলে, তুলসী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে অসীম ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব দান করিয়াছেন। পরোপকারের জন্য এরূপ সুযোগ লাভ করা এ জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন ও দীনপালন দ্বারা ঈশ্বরের এই দুর্লভ দানকে সম্পূর্ণ সার্থক করুন। আপনার বিশাল ধনাগারে যে সকল মহামূল্য মণিরত্ন আছে, সে সকলের অপেক্ষা নির্ম্মল দয়ার্দ্র হৃদয়কেই আপনি অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করিবেন। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের জলন্ত দৃষ্টি আপনার উপর সর্ব্বদাই নিবদ্ধ। আপনি সমস্ত সংসারকে ফাঁকি দিতে পারেন, কিন্তু সে সর্ব্বসাক্ষীর দৃষ্টির নিকট আপনার কোনও চাতুরী খাটিবে না। সর্ব্বত্র সমতা ও শুভ দৃষ্টিই রাজধর্ম্ম। পক্ষপাতী, লোভান্ধ রাজার রাজ্য ছারখার হয়। প্রজার সুখসমৃদ্ধিই

রাজার অভ্যুদয়,—"লোকাধারাঃ প্রিয়ো রাজ্ঞাম্!" সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তুলসীর অলৌকিক সাধুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন।

তুলসী একদা বিঠুর হইতে আসিতে-ছিলেন। পথে শণ্ডিলনামক স্থানে, এক ব্রাহ্মণ, পত্নীসহ আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, এবং কাতর ভাবে কহিলেন,—প্রভু! আমরা পুত্রহীন। পুত্রের জন্য নানা দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ফল পাইলাম না। তাই, বংশলোপভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি। শুনিয়াছি, ভবাদৃশ সাধুর কৃপায় অসাধ্যও সিদ্ধ হয়। এ শরণাগত ব্রাহ্মণদম্পতীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। তুলসী স্বহস্তে তাঁহাদিগকে দুই-খানি রামকবচ লিখিয়া দিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক উহা ধারণ করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন, "তোমরা শুদ্ধভাবে থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিও। তোমাদের বংশ অক্ষয় হইবে এবং সকলেই রামভক্ত হইবে।" আরও বলিলেন,—"এক বৎসরের মধ্যে তোমাদের একটী সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, এবং সেই সন্তান পরম ভক্ত ও মহাকবি হইবে।" বাস্তবিক তাহাই হইল। ব্রাহ্মণদম্পতী সংবৎসরমধ্যে অপূর্ব্ব পুত্র-রত্ন লাভ করিলেন। ঐ পুত্রের নাম বংশীধর; তিনি "কবীশ্বর বংশীধর" নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের বংশপরম্পরা অদ্যাপি বর্ত্তমান; সকলেই ভগবদ্‌ভক্ত, সুশীল ও আতিথেয়। ঐরূপ পর্য্যটনকালে তিনি জৈরামপুর নামক গ্রামের সন্নিহিত এক বিস্তীর্ণ মাঠ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, অত বড় মাঠে একটীও বৃক্ষ নাই। গ্রীষ্ম-কালে তথায় পথিকদিগের বিশ্রামলাভের কোনও উপায় নাই। তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন;—ঐ স্থানে বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহা শুকাইয়া যায়, জলসেকও নিষ্ফল হয়। এই জন্য ঐ স্থান মরুভূমির ন্যায় পতিত রহিয়াছে। তিনি ঐ কথা শুনিয়া, একটী জীর্ণশীর্ণ বটশাখা লইয়া ঐ স্থানে স্বহস্তে রোপণ করিলেন। বলিয়া দিলেন;—"এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইলে, ইহার নাম "বংশীবট" রাখিও। প্রতি বর্ষে এই স্থানে রামলীলা উৎসব করিও।" স্বল্প-কালেই সেই জীর্ণশাখা অপূর্ব্ব বৃক্ষে পরিণত হইল। সেই বংশীবট অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অসংখ্য শ্রান্ত পান্থকে অমৃততুল্য ছায়া দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছে। প্রতিবর্ষে সেই স্থানে রামলীলা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নীতিস্তবক।

১। মানুষের চক্ষুদুটী এমন স্থানে বসান আছে যে, মানুষ সকলেরি মুখ দেখিতে পায়, কেবল নিজের মুখ দেখিতে পায় না। অর্থাৎ অন্যের মুখে যে সব দোষ আছে, তাহাই দেখিতে পায়, নিজের মুখাকৃতির দোষ তাহার চক্ষে

পড়ে না। কিন্তু যাহার জ্ঞানচক্ষু আছে, সে অগ্রে নিজের দোষ দর্শন করে।

২। শাস্ত্রে আছে;—"ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরার্থে নিজ ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ আত্মবিসর্জ্জনে শিক্ষিত হয় নাই, তাহার নিকট শাস্ত্রের কথা উপকথা।

৩। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস অটল, ঈশ্বর তাহার সঙ্গেই থাকেন। কোটি কোটি শত্রুও তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। সে অশেষ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসিগণের নিত্য সহায়।

৪। যাহার হৃদয় দয়ায় ও সরলতায় পূর্ণ, ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

৫। যে ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাঁহার অনুসন্ধান করে, সে অযাচিতভাবে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ করে।

৬। ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের মধ্যে ঈশ্বরকে পাইবে না, পবিত্র আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান কর, সে নিধি মিলিবে।

৭। মানবকে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহার তেজে পাপরাশি দগ্ধ ও তাহার প্রেমচন্দ্রিকায় জগৎ শীতল হইবে।

৮। সংসারের সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত বিদ্যমান। বিশ্বাসী ব্যক্তি জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেন।

৯। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

—"নহীশ্বর ঈশ্বরচেষ্টিতং জগৎ"।

১০। কাহারও কোনও উপকার করিয়া, "আমি করিলাম"—এ অভিমান বৃথা। ঈশ্বরই করেন, তুমি—আমি নিমিত্তমাত্র।

১১। যে স্ত্রী আপনার স্বামীর মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারেন নাই, যাঁহার স্বামীর মন পরস্ত্রীদর্শনে আকৃষ্ট হয়, তিনি আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপত্নী স্বামীর মন এতদূর অধিকার করেন যে, তাঁহার স্বামীর মন অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না।

১২। ধর্ম্মগুরু কবীর বলিয়াছেন;—পুত্ আর মৃত্ এক স্থান হইতে আসিয়া থাকে। যে পুত্ পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল না করে, সে পুত্ নহে, সে মৃত্।

১৩। যে প্রভুকে তাহার অনুজীবিগণ ভক্তিশ্রদ্ধা না করে, যাহাকে আত্মরক্ষার্থ সদাই রক্ষিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়, সে প্রভু দস্যুমধ্যে গণ্য।

১৪। মানুষ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই নিজের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করে।

১৫। যাহার হৃদয় শিশুর ন্যায় কোমল ও সরল, যে ধরণীর ন্যায় সহিষ্ণু, গিরির ন্যায় অটল, তাহাকেই বীর বলে।

১৬। যে মানব সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সহিত নিজ প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, সে কখনও অসুখী হয় না।

১৭। তোমার অন্তরের নিগূঢ়তম

স্থান ও সর্ব্বসাক্ষীর অগোচর নহে। আমায় এ কার্য্য কেহ দেখিল না, যে মনে করে, সে বড়ই ভ্রান্ত।

১৮। মানবমাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। সকলকেই সৈনিক হইতে হইবে। অধর্ম্মের সহিত যুঝিতে যুঝিতে যে সেই বিজয়লক্ষ্মী ঈশ্বরকৃপা অধিকার করিবে, সেই রণজয়ী বীর।

দেবী—না মানবী।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মালব প্রদেশের সিংহাসনে এক ধর্ম্মশীলা হিন্দুমহিলা অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁহার নাম অহল্যা বাই। ভারতের অতীত ইতিহাসে যে সকল মহিলার পবিত্র কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে অহল্যাবাইয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মালবপ্রদেশের রাজা ,কণ্ডীরাওএর সহিত অহল্যাবাইএর বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামিসুখভোগ তাঁহার ভাগে বেশী দিন ঘটে নাই। পতির মৃত্যুর পরই একমাত্র পুত্র মালরাও অতি অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মালরাওএর মৃত্যুর পর অহল্যা বাই স্বয়ং মালবের অধীশ্বরী হইলেন। পতি ও পুত্র হারা হইয়া তিনি কিছুকাল কন্যা মুক্তাবাইকে লইয়া শান্তির অন্বেষণে ব্যস্ত রহিলেন। কিন্তু শোকসন্তপ্ত হইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর গঙ্গাধর যশোবন্ত নামক একজন রাজপুরোহিত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রাজপুরোহিত গঙ্গাধর অহল্যাবাইকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ইনি ভাবিয়াছিলেন যে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে তিনি স্বয়ং রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান হইয়া থাকিতে পারিবেন। কিন্তু অহল্যাবাই পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাজ্যের যাহাতে প্রণষ্ট গৌরব ফিরিয়া আইসে যাহাতে রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তাই তিনি গঙ্গাধরের প্রস্তাবে বিনীত ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে গঙ্গাধরের হৃদয়ে বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য রাঘব দাদাকে অহল্যা বাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরের পরামর্শে রাঘব শীঘ্রই অহল্যা বাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন।

অযথা নর-রক্তপাতের আশঙ্কায় ধর্ম্মশীলা অহল্যা বাই একটু বিচলিত হইলেন এবং মহারাষ্ট্রের রাজা মধুরাওকে আপনার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া একখানি অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিলেন। মধুরাও আপন পিতৃব্য রাঘব দাদাকে নিরস্ত করায় যুদ্ধসজ্জা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

গঙ্গাধর যশোবন্ত বড়ই বিপদে পড়িলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি পুনরায় অহল্যা বাইয়ের শরণাপন্ন হইলেন। অহল্যাবাই তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদ প্রদান করিলেন। তুকাজী হুলকার নামক অহল্যা বাইয়ের একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিল। অহল্যা বাই স্বয়ং মহীশূরে থাকিয়া শাতপুরা পর্ব্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ সকলের রাজস্ব আদায় করিতেন এবং তুকাজী দক্ষিণ প্রদেশে থাকিয়া হুলকারের অধীনস্থ প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। এদিকে নিমাড়, মালব ও দক্ষিণ অঞ্চলের রাজস্বও তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত।

অহল্যা বাই কখনই প্রজার রক্ত শোষণে ব্যস্ত ছিলেন না। তাই তিনি শ্রীহীন সামান্য গ্রাম ইন্দোরকে একখানি সমৃদ্ধিশালী প্রসিদ্ধ নগর করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ব্যয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি দুই কোটি টাকা হুলকার রাজ্য হইতে পাইয়াছিলেন। এই সকল টাকাই তিনি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইলে পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত সঞ্চিত থাকিত। ভারতবর্ষের সকল রাজার প্রতিনিধি আসিয়া রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন এবং অহল্যা বাইয়ের প্রতিনিধিগণ হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, পুণা, লক্ষ্নৌ, কলিকাতা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া সেই সকল স্থানের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অহল্যাবাই বহু অর্থব্যয়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপরে জাম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করান। পরে ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটী দুর্গ তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে অহল্যা বাইয়ের বিশেষত্ব ছিল। তিনি রাজসভায় মন্ত্রিগণ ও পারিষদবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। হিন্দুমহিলার ন্যায় তিনি চব্বিশ ঘণ্টা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহার জীবনপ্রণালী অতীব শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে শিবপূজায় নিযুক্ত রহিতেন। পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া কিছুকাল নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্ম-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। তৎপরে পাঠান্তে নিজ হস্তে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং আহার করিতেন। আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতেন। বেলা আড়াই প্রহরের সময় রাজসভায় উপস্থিত হইতেন এবং সায়ংকাল পর্য্যন্ত রাজ্যের অভাব অভিযোগ বিচারান্তে সায়ংকৃত্য সম্পন্ন করিয়া রাত্রিকালীন ভোজন করিতেন। ভোজনের পরও তিনি কিছুকাল পুনরায় রাজদরবারে বসিতেন। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" এই কথাটী রাণী অহল্যা বাইয়ের চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল।

অহল্যা বাই ধর্ম্মশীলা ও অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। আর্ত্তের অশ্রুজল ও কাঙ্গালের হৃদয়বেদনা তিনি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতেন। তাঁহার ন্যায় দয়াবতী রমনী জগতে দুর্ল্লভ,সন্দেহ নাই। তাঁহার স্থাপিত কীর্ত্তিসমূহ অদ্যাপি জগতে হিন্দুরমণী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রতি বৎসর শত শত নর নারী হিন্দুতীর্থ কেদারনাথে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে গমন করিয়া থাকেন। অহল্যা বাই যাত্রীদিগের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত একটী ধর্ম্মশালা ও একটী কুণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মশালা আজিও মন্দরনামক স্থানের উত্তরাংশে পুণ্যবতী অহল্যাবাইয়ের চরিত্রচিত্রের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা ও কূপ, মালব ও মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে অদ্যাপিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কীর্ত্তি হিন্দুতীর্থ—শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্রাবিড়, প্রভৃতি স্থানে শত শত যাত্রীর অভাব অভিযোগ দূর করিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা গয়াতেই অহল্যাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত বহু দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-পদ-মন্দির ও লাটমন্দির অদ্যাপি বিদেশীয় চিত্রকরদিগের বিস্ময়াকর্ষণ করিতেছে। ইদানীন্তন যেসকল নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক মাতৃভূমির অবমাননা করিয়া ভারতের কলাবিদ্যার দরিদ্রতা সপ্রমাণ করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা একবার—Indian Antiquary পাঠ করুন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর গ্রিফিথ সাহেব ভারতের চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"When I saw long delicate carves drawn without faltering with equal precision upon the horizontal surface of ceiling,where the difficulty of execution is increased a thousand fold—it appeared to me nothing less than miraculous" (Indian Antiquary, Vol. III, p. 26.)

আমাদের নিজের দেশের খবর আমরা রাখিনা বটে—কিন্তু গুণগ্রাহী ইংরেজ-সমাজ সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আগ্রহভরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অহল্যাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির এবং লাটমন্দির দেখিলে অতীত গৌরবকাহিনী মানসপটে উদিত হইয়া নয়নপ্রান্তে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার হয়। মন্দিরের কারুকার্য্য যেন বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে করিয়াছেন। মানবের তুলিকাস্পর্শে এত মনোরম—এত রমণীয় চিত্র চিত্রিত হইতে পারে—এ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। মন্দিরের উপরিভাগ এমনই নিপুণ হস্তে খিলান যে, দেখিলে মনে হয় যেন শূন্যমার্গে উহা আপনা হইতেই ঝুলিয়া রহিয়াছে। মন্দিরটী দেখিলে নয়নের অভাব বলিয়া মনে হয়; দুটী মাত্র চক্ষু দর্শনকার্য্য সম্পন্ন করিতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

বাল্যকাল হইতেই অহল্যাবাইয়ের হৃদয়ে

প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। গয়ার একটী দেবমন্দিরে এই ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বী সতীর একখানি পবিত্র চিত্র আছে। মন্দিরমধ্যে রাম সীতার যুগল মূর্ত্তি,—নিকটে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, শিব-ভক্তা অহল্যাবাই ভক্তিগদগদচিত্তে শিব-পূজায় নিযুক্তা রহিয়াছেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মশীলা অহল্যাবাইয়ের পবিত্র আত্মা পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে প্রগাঢ় ধর্ম্মপ্রাণতার দ্বারা তিনি সমগ্র হিন্দুনারী-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল যে ভারত ইতিহাসে প্রগাঢ় ভক্তিভরে কীর্ত্তিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার ত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি প্রত্যেক দেবালয়ে দান করা হইত। দারিদ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিত। তিনি শীত-কালে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান এবং গ্রীষ্ম-কালে পথিকদিগের নিমিত্ত স্থানে স্থানে অন্নসত্র ও জলসত্রের সুব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। পশু পক্ষীর প্রতিও তাঁহার দয়া সমভাবে ছিল। ক্ষেত্রে কৃষকেরা পাখী বসিতে দিত না,—তাই অহল্যাবাই কৃষক-দিগের নিকট হইতে শস্যক্ষেত্র ক্রয় করিয়া পাখীদের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিতেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা, রাজসাহী।

আমি।

(১)

মাটীর পুতুল আমি
তোমার হাতেতে গড়া,
তোমারি খেলনা নাথ!
তোমারি বসন পরা।
সকলি তোমার দেওয়া—
প্রেমময়—দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।

(২)

আমি কে? তোমারি দাস,
তোমারি চরণধূলি,
তোমারি মুখেতে বলি
তোমারি শিখান বুলি;
তোমারি সকল প্রভো!
প্রেমময়! দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

জাপানের অভ্যুদয়।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

১৮৯৪-৯৫ সালের China-Japanese war-এর পর হইতে (the great expansion of national resources after the close of the C. J. war) শিল্প-

বিদ্যার মূল্য জনসাধারণ বুঝিতে লাগিল। সেই সময় হইতে technical স্কুল অতি শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শিল্প-শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খোলা হইল। কৃষিবিদ্যালয় ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য স্কুল স্থাপন করা হইল। এক্ষণে জাপানে ২৭,১৫১টী Elementary School—এ ৫১৩৫৪৮৭ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। শিক্ষোপযোগী বালকদিগের মধ্যে শতকরা ৯১½ ছাত্র শিক্ষা লাভ করে। ৫৭টী Normal স্কুলে ১৯১৯৪ ছাত্র অধ্যয়ন করে। শিল্পশিক্ষার জন্যsupplementary স্কুলসংখ্যা ৬৩০ এবং তথায় ৩১০১৩ ছাত্র অধ্যয়ন করে। Technical শিল্পবিদ্যালয় class এবং Apprentice স্কুলের সংখ্যা ৯৯, এবং সেখানে ৬৫১০ জন ছাত্র। ২৫৮টী Middle School—ছাত্রসংখ্যা ৯৫,০২৯। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার স্কুল ৮০, ছাত্রীসংখ্যা ২১৫২০। গভর্ণমেণ্ট Higher Normal School ৩টী—ছাত্র ১০০০। Industrial School ও Technical School of class A ১৩০, ছাত্র ২০৩৩। Imperial University ২টী—ছাত্রসংখ্যা ৪০৪৬। Private ও Public college, সংখ্যা ৫০, ছাত্র ১৬৯৬০। Government Teacher's Training Institute ৮টী—ছাত্র ৩১৯। Blind ও Dumb School গবর্ণমেণ্ট ২টী ও১৮টী private ও public. Library ৬৭। Private ও Public Miscellaneous School১৬৫৭টী। রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে যদিও এসিয়ার পূর্ব্বে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি জাপানের বিদ্যালোচনা স্থিরভাবে চলিতেছে; ইহাতে উৎসাহ কম হওয়া দূরে থাঁকুক, ছাত্র ও শিক্ষকগণ উৎসাহে ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতেছেন। যদিও রাজ্যের অন্য বিভাগের খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবমত কম করা হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের খরচে আদৌ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জাপানে শিক্ষাকে জাতীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির প্রধান উপকরণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অতীব দুর্ব্বল বা রোগাক্রান্ত না হইলে কাহারো মূর্খ থাকিবার অধিকার নাই। আজি সেই শিক্ষার বলে সকলে এক উদ্দেশ্যে দেশের উন্নতিকল্পে ও দেশ-রক্ষার্থে স্বীয় জীবনকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতেছে। ইহাদের যদি উন্নতি না হইবে ত হইবে কাহার? জাপানী স্ত্রীলোক-দিগের "শিক্ষা, পারিবারিক পরিচর্য্যা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি দর্শন করিলে মনে হয়, ভারতের মহিলাগণ কোনও গভীর অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্ন।" পুত্র কন্যাকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, উহা তাঁহারা জানেন।"

জাপানের জননীরা পুত্রকন্যাদিগকে কখনও তীব্র ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেন না। কোনরূপ দোষ করিলে স্নেহ মমতার স্বরে ছেলেকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার ত্রুটি হইয়াছে। এই জন্যই জাপানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে অতিশয় কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন দেখা যায়। চারি

বৎসরের শিশুর নিকট মাতারা যে সব বীরত্ব ও পুণ্যকাহিনী বিবৃত করেন, উহা তাহার ধমনী মজ্জাতে গ্রথিত হইয়া যায়। শিশুরা অতি শৈশবকাল হইতেই এক মহান্ লক্ষ্য লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। জাপানে ছেলেদের ক্রীড়া ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা, এবং মেয়েদের শিল্প-কার্য্য ও উদ্যানভ্রমণ। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অতি শৈশবকাল হইতে যেরূপ স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ করে, সেখানে সেরূপ নয়। জাপানে ১৭।১৮ বৎসরের বালক ১৪।১৫ বৎসরের বালিকা স্ত্রী পুরুষে বিভিন্নতা কচিৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। উহারা পরস্পরের সহিত এমন পবিত্র ও স্বাধীনভাবে মিলিতে পারে যে ভারত-বাসীর পক্ষে ইহা অদ্ভুত দৃশ্য বলিয়া বোধ হইবে। জাপানের মেয়েরা ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে কিম্বা কোন শিল্পশিক্ষালয়ে অধ্যয়ন করেন, এবং যে পর্য্যন্ত কোন প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষায় পারদর্শী না হন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সাংসারিক জীবনের অযোগ্য মনে করেন, সে পর্য্যন্ত শিক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে, জাপানের প্রায় প্রত্যেক বয়স্থা কন্যা জানেন,—পরিজনের প্রতি, স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি। সেই জন্যই জাপান এত উন্নত।

শ্রীকরালী চরণ হাজরা।

কবীর।

কবীর পান্থী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কবীর কাহার পুত্র অথবা কোন জাতীয়,তৎসম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে। মুসলমানেরা বলেন কবীর মুসলমান ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জাতি কুল ও জন্ম বিষয়ে নানারূপ অলৌকিক বর্ণনা আছে। সেগুলি অবিশ্বাস্য বোধে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—তিনি তন্তুবায়ের ঘরে জন্মিয়াছিলেন,সুতরাং তিনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। প্রথমে কবীর জাতীয় ব্যবসায়ানুসারে বস্ত্র-বয়ন করিতে শিখেন, তৎপরে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—এ সংসার অসার, এ জীবন পদ্মপত্রে জলের মত। কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করিবে?

একদিন কবীর কতকগুলি সাধুর নিকট যাইয়া আপন মনোভাব জানাই-লেন। সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই? কি চাস্?" তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে তন্তুবায়, রামানন্দের শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি।"বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া কহিল, 'তুই ম্লেচ্ছ! তোর গুরু কে হইবে?' তখন কবীর নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হওয়ায় তিনি পুনরায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনোবেদনা

জানাইলেন। এবারও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। তিনি অস্থিরচিত্তে কাশীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি বলিতে পার গুরু রামানন্দ কোথায় ?" এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিন একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দয়া করিয়া বলিল,—"গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রিশেষে বহির্দ্বার খুলিয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হন। তুই রাত্রি থাকিতে তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে যাইয়া শুইয়া থাকিস্। যখন দ্বার খুলিয়া তিনি বাহিরে আসিবেন, তাঁহার পদ তোর অঙ্গে লাগিবে। তৎকালে তিনি যে নাম উচ্চারণ করিবেন, তাহাই তুই গুরুমন্ত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবি। ইহা ভিন্ন রামানন্দের শিষ্য হইবার অন্য কোন উপায় নাই।" কবির বৈষ্ণবের কথায় আশ্বস্ত হইলেন। শুভদিনে রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়া শুইয়া রহিলেন। রাত্রিশেষে রামানন্দ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কুশ তিল লইয়া স্নানার্থে যেমন বাহির হইবেন, অমনি কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হইল; কবিরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয়া চুম্বন করিলেন। রামানন্দ ম্লেচ্ছের গায়ে পা লাগিল দেখিয়া 'রাম! রাম! কে তুই?' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে কবীরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সেই অবধি কবীর 'রাম নাম' সার করিলেন। তিনি স্তব স্তুতি কিছুই জানিতেন না, কেবল রামনামই মুক্তির সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমালা ধারণ করিয়া অপরাপর বৈষ্ণবের মত কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। কবীরের আচার ব্যবহার দেখিয়া বৈষ্ণবেরা ক্রুদ্ধ হইল। একদিন তাহারা কবীরকে ডাকিয়া বলিল,—রে ম্লেচ্ছাধম! তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিতেছিস্? কে তোরে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিয়াছে। কবীর নিতান্ত শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "সত্যই বলিতেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই আমি এমন হইয়াছি।"

সকলে আসিয়া রামানন্দকে কবীরের কথা বলিল। রামানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গুরুর নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, প্রভো! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন রাত্রিশেষে আমি আপনার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম, আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রামনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই দিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি। সেই দিন হইতে নিয়তই রামনাম জপ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই দিন হইতে কবীরকে সকলে একজন ভক্ত বলিয়া জানিলেন।

কবীর যে কেবল ভক্ত ছিলেন, তাহা

নহে; অত্যন্ত দয়ালু বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। একদিন একখানি বস্ত্র লইয়া তিনি বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, তখন শীতকাল; পথে জনৈক বৃদ্ধ শীতার্ত্ত হইয়া বস্ত্রখানি চাহিল, কবীর তখনই অম্লানবদনে তাহাকে বস্ত্রখানি দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সংসারের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। আজ যে তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, তাঁহার মাতা যে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়া গৃহে যাইবেন? তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে এই বস্ত্রখানি দিয়া আমার যে সুখ হইল, বস্ত্রখানি বেচিয়া অর্থ লইয়া এমন সুখ তো পাইতাম না। কবীর গৃহে আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। কবীর জননীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"সে কি কবীর তুমিই যে লোক দিয়া আমাকে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছ।" তখন কবীর ভক্তি-গদ্‌গদ ভাবে মাতাকে কহিলেন,—"ভগবৎ-কৃপাতেই এ সকল আমরা পাইয়াছি।" এই মত দৈব উপায়ে অর্থপ্রাপ্তি ও দান সম্বন্ধে কবীরের অনেক খ্যাতি ও অলৌকিক বর্ণনা আছে। সে সকল বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কিছুদিন পরে কবীর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তখন দিল্লীতে যবনরাজ শিকন্দর লোদী রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্ট লোকেরা যবন-রাজকে জানাইল যে, কবীর নামে এক দুষ্ট জোলা আসিয়া অনেককে বঞ্চনা করিতেছে, এরূপ লোককে রাজার শাস্তি দেওয়া উচিত। সিকন্দর কবীরকে ধরিবার আদেশ করিলেন। কবীর ধৃত হইলেন, এবং শুনিলেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। যবনরাজসমীপে কবীর আনীত হইলে রাজপুরুষগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কাহাকে আবার প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?" তখন যবনরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যমুনার অগাধ জলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন, রাজ-পুরুষেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে যমুনার অগাধ জলে ফেলিয়া দিল, কিন্তু তিনি কোনও উপায়ে তাহা হইতে রক্ষা পাইলেন। সেই কথা সকলে যবনরাজকে জানাইল। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও যখন কবীরকে বধ করিতে পারিলেন না এবং সকলে কবীরের প্রশংসা করিতে লাগিল দেখিলেন, তখন সিকন্দরের মন টলিল। তিনি কবীরকে ডাকিয়া সাদরে কহিলেন, "সাধো আমার দোষ ক্ষমা করিও। তুমি মহাজন, আজ আমি বুঝিতে পারিলাম।" কবীরের সিকন্দর কর্ত্তৃক এই বধচেষ্টার সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক বর্ণনা আছে; সে সকল নিষ্প্রয়োজন বোধে এ স্থলে পরিত্যক্ত হইল।

তথা হইতে কবীর কাশীধামে আসি-লেন। এখানে তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইলেন। এই কাশীতেও চারি দিকে তাঁহার বিপক্ষ

ঘুরিত, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু ভগবানের কৃপায় কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। যুগে যুগে সাধুগণের প্রতি অত্যাচারের পরিণাম যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইত। শেষে তাহারা আপনাদিগের কুকার্য্যের জন্য আপনারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। কাশীবাসি মাত্রেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। এমন কি একটী বারবিলাসিনীও দূর হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উদ্ধার পাইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে এইরূপ জানা যায় যে, একদিন তিনি মণিকর্ণিকার পরপারে আসিয়া ঐ স্থানে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় মৃত্তিকোপরি শয়ন করেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। শিষ্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করে। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় অর্থাৎ আর তিনি উঠেন নাই। কিন্তু শিষ্যেরা বস্ত্রমধ্যে আর তাঁহার মৃতদেহ পায় নাই। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহার দেহের সংকার লইয়া অনেক বিবাদ হইয়াছিল, কিন্তু বস্ত্রমধ্যে তাঁহার মৃতদেহ প্রাপ্ত না হওয়ায় সে বিবাদের কোন মীমাংসা হয় নাই।"

(ভক্তমাল গ্রন্থ ১৮০-১৮৫ ১ পৃঃ)

বস্তুতঃ কবীর যে একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনি যে জাতীয়ই হউন, তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শাস্ত্র ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম স্বতন্ত্র নয়, অনুসন্ধান কর হৃদয়ে দেখিতে পাইবে। এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, আলি ও রামেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার পীর। তিনি জপ পূজা স্বীকার করিতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—

"মনকা ফেরত জনম্ গয়ো গয়ো নাও
মনকা ফের।
করকা মন্‌কা ছোড় কর্ মন্‌কা ফের॥"

জপ-মালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের ঘোর কাটিল না; তাই বলি,—হাতের গুটি ছেড়ে মনের গুটি ঘুরাও।

তিনি জাতিভেদও স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বচনে পাওয়া যায়—

সব্‌সে হিলিয়ে সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে
নাঁও।
হাঁজী হাঁজী সব্‌সে কিজিয়ে বসে আপন
গাঁও॥

সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের সহিত মিলিবে, সকলের নাম গ্রহণ করিবে, হাঁজী হাঁজী সকলেই বলিবে, কিন্তু আপন জায়গায় থাকিবে।

তিনি সংসারকাণ্ড দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেন—

"বাম্‌হন্ টাঁসিন মুরখ ভয়ে শূদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ্ ঠগর বন্দ আচ্ছা থাবে দুঃখ পাবে
পণ্ডিতা॥

সাঞ্চাকো মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়।
গোরস্ গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ
বিকায়॥
সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান্ পহরে
খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকো
তামাসা॥"

কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীরা তাঁহার সময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ১২০৫ সম্বতে কবীর টকুসার শাস্ত্র প্রকাশ করেন, এবং ১৫০৫ সম্বতে মগর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে প্রায় ৩০০ শত বর্ষ কবীরের পরমায়ু হইয়া পড়ে। ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, তিনি যে সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সিকন্দর ১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য পান; অতএব এই সময়ে যে কবীর বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায়। শিখদিগের ধর্ম্মগুরু নানকও কবীরের মত আপন ধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সৎনামী সাধু, শ্রীনারায়ণী ও শূন্যবাদীদিগের গ্রন্থেও কবীরের বচন পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণও কবীরের মত লইয়া সেই সঙ্গে স্ব স্ব মত প্রচার করেন।

কবীরপন্থীরা সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্। রামানন্দী ও অপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের বেশ সদ্ভাব ও আচার ব্যবহার প্রায় একরূপ, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলে। ইঁহারা বৈষ্ণবের ন্যায় বেশ ভূষা করেন, এবং হাতেও তুলসীর মালা ধারণ করেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা জানেন এ সবই বৃথা আড়ম্বর মাত্র। বাস্তবিক ইহাঁরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর উপাসনা ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন না। কবীরপন্থীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ দুই দল,—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী; গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত আচারাদি অবলম্বন করেন। কেহ আবার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুর দেবদেবীরও পূজা করেন। সন্ন্যাসীরা নয়নের অগোচর কেবল কবীরেরই ভজনা করেন। তাঁহাদের গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা কেবল ধর্ম্ম গান করাকেই উপাসনা মনে করেন। সকলেই ইচ্ছানুরূপ বেশ ভূষা করেন। কেহ কেহ উলঙ্গ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। ইহাদের মহন্তেরা মাথায় টুপী পরেন। উক্ত দুই দল প্রধানতঃ ১২ শাখায় বিভক্ত। ঐ ১২ শাখা ব্যতীত আরও কতকগুলি শাখা আছে। ইহারা অপর স্থানাপেক্ষা বারাণসীর কবীরচৌরা নামক স্থানকেই প্রধান তীর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত জানা যায় না, তবে হিন্দুধর্ম্ম হইতেই যে উক্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে কবীরধর্ম্মই সত্য, অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। সংসারত্যাগ ও

গুরুভক্তিই ইঁহাদের মতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দোষ করিলে গুরু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দণ্ড দিতে পারেন না।

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরপন্থী বাস করেন। ইঁহারা বড় সত্যপ্রিয়, উপদ্রবশূন্য ও নিতান্ত ভাল মানুষ। ইঁহাদের উদাসীনেরা অপরাপর সন্ন্যাসীর মত দুরন্ত-স্বভাব নহেন এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ান না। কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীরপন্থী আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ তথাকার কবীরপন্থীদিগের আহারাদির জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপুত্র চেৎসিংহ কবীরপন্থীদিগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে প্রায় ৩৫ ০০০ কবীরপন্থী সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীসরোজিনী দেবী।

নারীর গৃহধর্ম্ম।

মানবশিশু নারীজাতির কোমল হস্তগঠিত। পুণ্য-জ্যোতি বিভাসিত গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ত উন্নতির পথে পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ নারীজাতির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দেশ বিদেশের সহস্র মহৎ লোকের পুণ্যময় জীবনী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সভ্যতার প্রাদুর্ভাবের সহিত বঙ্গগৃহে বিষম পরিবর্ত্তনের বন্যা অশাসিত ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র জীবনাদর্শ গৃহে অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা একান্তই আশঙ্কাজনক ও ভারতনারীর অগৌরবের কারণ। আমি সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি. অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহই যেন ইহা মনে না করেন। নিষ্ঠা, সংযম, ভগবানের করুণায় প্রগাঢ় বিশ্বাস, সাধুতা কোন সম্প্রদায়েরই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। গৃহই পুরুষগণের সর্ব্ববিধ সুখ শান্তি ও আরামস্থল। এই রাজ্যটীতে স্নিগ্ধ শান্তি, শুদ্ধতার বিমল স্রোত প্রবাহিত করার সম্পূর্ণ ভার নারীজাতির হস্তে। আমরা সেই পরম নিষ্ঠাবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমার পবিত্র স্মৃতি অতীব শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও উপকৃত হই। তাঁহারা সংসারের মহাপ্রতিকূল অবস্থায় ঘোর রোগ শোকের তুফানে, যে প্রকার বীর নারীর ন্যায় সংগ্রাম করিয়া ছিন্ন ভিন্ন সংসারকে ধর্ম্মের বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আজ ত তাহা স্মরণ করিয়া কত উপকৃত হইতেছি। সংসারের অগণিত কঠোর ও জটিল কর্ত্তব্য সংসাধনে তাঁহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কদাচ বিন্দু পরিমাণে ইতস্তত করেন নাই। এত

কর্ম্মকোলাহলে ডুবিয়াও স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠান ভুলিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। আমাদের কোমল শৈশব হৃদয়ে উপকথা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলিয়া যে ভাব উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারি না। ঘোর শ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখনই তাঁহারা গভীর নিশীথকালে বিরামদায়িনী নিদ্রার কোল আশ্রয় লইতে গমন করিতেন, আমরা এতগুলি আবদারে সন্তান গল্প বলিবার জন্য তাঁহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। দৈনিক জীবনে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই অসীম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাদিগকে পূজা করিত। এই উচ্চ স্থানই নারীর আরাধ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ভাবের অনিবার্য্য প্রবাহে ভারতের গৃহে গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মবিহীনতা ও অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া মিতাচারপূর্ণ বাঙ্গালীর গৃহ ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ করিয়াছে। এখনকার মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসীমা ও মামীগণ অনেকেই আমার ঠাকুরমাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গৃহের মধ্যে সন্তানাদির হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রভা বিস্তার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আশা করি, এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনাপূর্ব্বক আধুনিক মহিলাগণ ভবিষ্যৎবংশীয়দের অগঠিত হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে সতত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে যত্নবতী হইবেন।

স্বর্ণপ্রভা বসু।

দৃষ্টান্তে উপদেশ।

খৃষ্টধর্ম্ম-গুরু যিশুখৃষ্ট অনেক সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা মহা মহা উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে।

১। তিনি এক সময় বলিলেন, কোনও কৃষক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে গেলেন। তিনি যখন বপন করিলেন, তখন কতক বীজ রাস্তার ধারে আসিয়া পড়িল, তাহা পক্ষীরা ভক্ষণ করিল; কতক বীজ ভূমিতে পড়িল, সেখানে অল্প মাটি থাকায় অঙ্কুর শীঘ্র উৎপন্ন হইল, কিন্তু যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন সে সকল ঝলসিয়া গেল; কারণ তাহাদের শিকড় জন্মে নাই, সুতরাং অঙ্কুর শুকাইয়া গেল। কতকগুলি বীজ কণ্টক বনে পড়িল এবং কণ্টক গাছ বাড়িয়া তাহাদিগকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। কিন্তু কতকগুলি বীজ উত্তম ভূমিতে পড়ায় তাহা হইতে বৃক্ষ সকল জন্মিয়া ফল উৎপাদন করিল। কোন বৃক্ষে শত গুণ, কোন বৃক্ষে ষাটিগুণ, কোন বৃক্ষে ত্রিশগুণ ফল ফলিল। তিনি শিষ্যদিগকে গোপনে ডাকিয়া ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। সে অর্থ এই— স্বর্গরাজ্যের কথা যখন কোনও ব্যক্তি শোনে এবং বোধগম্য না করে, তখন

তাহার অন্তঃকরণে উপ্ত বীজ সয়তান আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। রাস্তার ধারে পতিত যে বীজের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ। প্রস্তরময় ভূমিতে যে ব্যক্তি বীজ পাইল, সে উপদেশবাক্য শুনিল এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল না। এই জন্য ধর্ম্মের জন্য যখন তাড়না বা উৎপীড়ন উপস্থিত হইল, তখন সে ধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারিল না, বিরক্ত হইয়া তাহা ছাড়িয়া দিল। যে ব্যক্তি কণ্টকের মধ্যে বীজ পাইল, সে উপদেশ শুনিল; কিন্তু সংসারের ভাবনা চিন্তা এবং অর্থের মায়াতে, ধর্ম্মের অঙ্কুর বাড়িল না এবং তাহা হইতে কোনও ফল উৎপন্ন হইল না। কিন্তু উত্তম ভূমিতে বীজ কে পাইল? যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, তাহারই হৃদয়ে ইহার ফল ফলিল,—কোথাও শতগুণ, কোথাও ষাটি-গুণ, কোথাও ত্রিশ গুণ ফলিল।

ম্যাথিউ—১৩ অ। ২৫ অ।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রী-চরিত্রের প্রভাব।

আমরা দেখি এ জগতে সকলেই এক উদ্দেশ্যে ধাবমান। সেটী কি? সুখ। সুখের জন্য আমরা কি না করিতেছি? কিসে সকলের অপেক্ষা অধিক ধন ও মান লাভ করিব, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানের অধিকারী হইব, এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব লইয়া আমরা প্রতি নিয়ত ঘূর্ণয়মান। ধন, মান ও সুখের লালসায় আমরা কতশত অন্যায় কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতেও সুখ লাভ হয় না; কারণ প্রকৃত সুখ এক-মাত্র সচ্চরিত্রতায়। আমরা সকলেই সুখের জন্য লালায়িত সত্য; কিন্তু এক একটী করিয়া চরিত্রের দোষ ও ত্রুটিসকল খণ্ডন পূর্ব্বক প্রকৃত চরিত্র লাভে সচেষ্ট নই। পরম পিতা পরমেশ্বরের রাজ্যে আমরা সকলেই সমানরূপ সম্পত্তি লাভপূর্ব্বক জন্ম-গ্রহন করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই আপন আপন বৃত্তিগুলিকে সতত ন্যায় পথে পরিচালনা করিয়া আদর্শ চরিত্র লাভ পূর্ব্বক প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে। সচ্চরিত্রতার মহিমা অপার। ইহা ইহকালে মানবকে দেবত্বে পরিণত করে এবং পরকালেও অনন্ত সুখের অধিকারী করে। জগতে এমন কিছু নাই, যাহার সহিত এই দুর্লভ রত্ন উপমিত হইতে পারে। পশুতুল্য ব্যক্তিও এই মহারত্নের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারে না। এ সংসারে সকলে সমান জ্ঞানী বা ধনী হয় না, কিন্তু চরিত্র উৎকৃষ্ট হইলে জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্য বহুদূর প্রসারিত হয় সন্দেহ নাই। ইহার নিকট ধন, মান, জ্ঞান, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতা, বিনীত ব্যবহার যাহাই হউক না কেন কিছুই সমকক্ষতা

লাভ করিতে পারে না। চরিত্র প্রভাবে একদিকে যেমন লোক-মণ্ডলীর শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভালবাসা লাভ অনিবার্য্য, অপর দিকে তদ্রূপ বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। চরিত্রবিহীনতায় মানুষকে এরূপ ঘৃণিত করে যে তাহার নাম মাত্র শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। হাজার যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও হৃদয়ের এ স্বাভাবিক ভাব দূর করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ চরিত্র সুগঠিত হইলে এ জগতে ভীষণ প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষার মধ্যেও আবাল বৃদ্ধ বনিতার শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্র হইয়া আদর্শ জীবন লাভ করা যায়।

ব্যক্তিনিষ্ঠ সচ্চরিত্রতা প্রত্যেক জাতি ও সমাজের আশা ভরসা। যে দেশবাসী যে পরিমাণে চরিত্রবান্, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে।

সমস্ত জাতির সমাজে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীচরিত্র কার্য্য করে। স্ত্রীলোক গৃহরাজ্যের রাণী। সুতরাং গৃহরাজ্যের সুখ শান্তি ও সুনিয়মের মূলে স্ত্রীচরিত্র কার্য্য করে। পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নানা আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া সন্তানচরিত্র গঠিত হয়। সন্তানগণের চরিত্র এবং জীবনের উপরেই সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি বা অবনতি দণ্ডায়মান। সন্তানচরিত্রই দেশীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি।

রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ সুকোমল ও প্রেমপরিপ্লুত। কিন্তু কেবল কোমলতাগুণে সংসারে শান্তি সংস্থাপন বা মহত্তর উদ্দেশ্য সংসাধন অসম্ভব। প্রলোভনের আক্রমণ নিবারণার্থ নারীহৃদয় বজ্রবৎ সুকঠিন আবরণে আবৃত রাখা আবশ্যক। যেহেতু রমণীগণ যদি হৃদয় হইতে বিকৃত সৌন্দর্য্যস্পৃহা সংযত করিয়া, সত্য, ন্যায় ও প্রেমের সুকোমল শাসন শক্তি বিস্তারে যত্নবতী হন, তবে পরিবার ও প্রতিবেশিমণ্ডলে সদ্ভাব ও সুখলাভ সহজ হইয়া উঠে। শালীনতা স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ। সাধুভাব ও বিনয় প্রভাবে জগতে স্ত্রীজাতি অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারেন। কারণ, পবিত্র চরিত্রের নিকট জগৎ পরাজিত। অহঙ্কার দ্বারা অনেক সময় আমরা কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হই এবং আমাদের আত্মা ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকে। বৃথা সময় ক্ষেপণ করিলে চরিত্রের মূল্য হ্রাস হইয়া যায় এবং প্রগল্ভতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও নানা দোষে চরিত্র ক্রমে ক্রমে কলঙ্কিত হইতে থাকে। পুষ্প যেমন সৌরভরাশি বিস্তার পূর্ব্বক মানুষের মন মুগ্ধ করে, চরিত্রও তদ্রূপ নানা সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া জীবনের সৌন্দর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি করে। চরিত্ররূপ চারা গাছ সদ্ভাবরাশি দ্বারা এ ভাবে বেষ্টন করিতে হইবে, যেন কেহ পদদ্বারা নষ্ট করিতে না পারে, অথবা অঙ্কুর ছাগল প্রভৃতিতে বিনষ্ট করিয়া না ফেলে। কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া গেলে, সদ্ব্যবহার স্বতঃ প্রবাহিত হয়। যাহার হৃদয় পবিত্র তাহার বাক্য কখন নীচ হইতে পারে না। যিনি যথার্থ বিনয়ী এবং যাঁহার স্বভাব প্রেমপূর্ণ, তাঁহার ব্যবহার বা বাক্য কখন কর্কশ হইতে

পারে না। অথচ তাঁহার ব্যবহারে বা বাক্যে তোষামোদের লেশমাত্র থাকে না।

আমরা চরিত্র সুসংগঠন অপেক্ষা অর্থোপার্জ্জনকে বিদ্যাভ্যাসের মূল কারণ বলিয়া মনে করি; কিন্তু প্রকৃত চরিত্র লাভ না করিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন সত্ত্বেও মানব কখনই যথার্থ সুখী হইতে পারে না।

অনেক স্ত্রীলোক বিশ্বকর্ত্তার বিধানে সন্তুষ্ট না হইয়া স্ত্রীজীবনকে অধিকতর দুঃখজনক মনে করেন। মঙ্গলময় মহাপ্রভুর আদেশ পালনের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইয়া অসন্তুষ্ট ও অলসভাবে জীবনকে দুঃখময় করেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি আছে? স্ত্রীজাতি তাঁহার চরিত্র-প্রভাবে জগতে কিনা করিতে পারেন? তাঁহাদের সংশিক্ষা ও সদ্ব্যবহারই সন্তান চরিত্রের ভিত্তিভূমি। এক একটী সন্তান সংসারে কি মহৎ কার্য্য না সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কত অনাচারী, বিপথগামী, দুর্দ্দান্ত পতি, পত্নীর পবিত্র প্রেমে পরাজিত হইয়া সৎপথাবলম্বী হইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে? বিবেকের প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ফলাফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিলে, এই সংসারেই স্বর্গ-সুখ মিলে। ফলতঃ চরিত্র জীবন নৌকার মাস্তুল বিশেষ। চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে ধর্ম্মভাব স্বতঃ সন্দীপিত হয়। স্বর্ণাভরণের উপরে চাকচিক্য, গোলাপের মধ্যে সুগন্ধ এবং সুশোভন দৃশ্যের উপর সূর্য্য-কিরণ যেরূপ মনোমুগ্ধকর, চরিত্রের মধ্যে ধর্ম্মভাব সেই প্রকার উজ্জ্বল ও হৃদয়রঞ্জক। চরিত্রের সহিত ধর্ম্মের সম্মিলন মণি-কাঞ্চন-যোগের ন্যায় পরম রমণীয়। আত্মজ্ঞান লাভ জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য। ধর্ম্ম-কার্য্যও গৃহকার্য্যের মধ্যেই গণনীয় বটে; কিন্তু সাংসারিক বাহ্যকার্য্যের অতীত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভও জীবনের একটী কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিদ্যা, সময় ও শক্তির প্রয়োজন। আমরা সাংসারিক কার্য্যে এত মুগ্ধ ও ব্যস্ত যে, মুক্তি-সাধনরূপ মহৎকার্য্য বিস্মৃত হইয়া থাকি। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এ বিষয়ে অধিকতর উদাসীন। শারীরিক ও মানসিক প্রভেদ বশতঃ স্ত্রী পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা সমান। উভয়ের মধ্যে পরমাত্মা সমভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভে উভয়েরই সমান যত্ন থাকা আবশ্যক।

আত্মা অবিনশ্বর এবং ইহার অলঙ্কারও তদনুরূপ হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, অথবা হীরকের জ্যোতিতে কি হৃদয় জ্যোতিষ্মান্ হইতে পারে? মুক্তা-জ্যোতিতে কি বিবেক-বুদ্ধি জ্যোতিষ্মতী হয়? জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদে কি চরিত্রের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? আত্মার যথার্থ অলঙ্কার সত্য, পবিত্রতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, আশা, প্রেম, আনন্দ ও নম্রতা। পরিণামদর্শিতা, তিতিক্ষা, শিষ্টতা এই সকল হৃদয়ের অলঙ্কার। এই সকল গুণ দ্বারা মানুষের অন্তর শোভিত হয়।

ঈশ্বরে ভক্তি চরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুকুট।

ইহার অভাবে কোন গুণই শ্লাঘনীয় বা মনোহারী হইতে পারে না। ধর্ম্মনিষ্ঠাদ্বারা মানুষ অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। অপরকে সংশিক্ষা দানে যত্ন করে। দিবানিশি সাধুকাজে ব্যস্ত থাকিতে ভাল বাসে, আত্মার অবিনশ্বরত্বের আশায় তাহার জীবনের দিন সকল উজ্জ্বলতর হয় এবং ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইলে প্রফুল্লহৃদয়ে পরজীবনে গমন করিতে পারে।

শ্রীবিনোদিনী সেন।

সাঙ্কেতিক ভাষা।

আজ বামবোধিনীর পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট একটী সাঙ্কেতিক ভাষা উপস্থিত করিলাম। ইহা অতিশয় আমোদজনক; এবং শিক্ষা করাও সহজ। যাঁহারা ইহা শিক্ষা করিবেন, তাঁহারা সহস্র লোকের মধ্যে থাকিয়াও কথাবার্ত্তা করিতে পারিবেন; অথচ অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। ইহা দ্বারা মুখে কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে হয় না; কেবল ইঙ্গিতে কার্য্য হয়। ইহাতে দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে আলোক সমক্ষে কথাবার্ত্তা চলিবে। অন্ধকারের জন্য পৃথক্ সঙ্কেত আছে; তাহা বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

শিক্ষাপ্রণালী—

শিক্ষার্থিগণ নিম্নলিখিত পদ্যটী মনে রাখিবেন।

"অহিকুম্ভ চক্রসহ ধরহ টঙ্কার।
তরবারি পাখা যাঁতা ক্রমবর্গ সার॥
বর্ণ মতে সংখ্যা ধরি অঙ্গুলি তুলিবে।
যুক্তবর্ণকালে তাহা কুঞ্চিত করিবে॥"

এক্ষণে ইহার অর্থ লেখা যাইতেছে।

অহি=সর্প।

কুম্ভ=মাটির ছোট ভাঁড়।

চক্র=গোলাকার অস্ত্র বিশেষ। বা কুম্ভকারের চাক।

টঙ্কার=ধনু।

তরবারি=অস্ত্র।

পাখা=যাহাতে বাতাস করা যায়।

যাঁতা=যাহাতে ডাল কলাই ভাঙ্গা হয়।

ক্রমবর্গসার=বর্গক্রমে অহিকুম্ভাদি ব্যবহার করিতে হইবে।

যথা—

অহি অর্থে স্বরবর্ণ বুঝায় ও অনুস্বার বুঝায়;
কুম্ভ অর্থে কবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
চক্র অর্থে চবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
টঙ্কার অর্থে টবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
তরবারি অর্থে তবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
পাখা অর্থে পবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
যাঁতা অর্থে য র ল ব শ ষ স হ বুঝায়।

মনে করুন,—"আমি ভাল আছি" এইটী ইঙ্গিতে বলিতে ইচ্ছা করি।

"আমি"—

"আ" অহি মধ্যে পড়িয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ হস্তকে সর্পের চক্রের আকার

করিতে হইবে ; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে স্বরবর্ণ বলা হইতেছে। তারপর দুইটী অঙ্গুলি দেখাইতে হইবে, তাহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ বলা হইতেছে ; সুতরাং "আ" পাওয়া গেল।

"মি"—

"ম" পবর্গের পঞ্চম বর্ণ। সেই জন্য হস্ত দ্বারা পাখায় বাতাস করার ভাব করিতে হইবে, তাহা দ্বারা বুঝা গেল যে পবর্গের কোন বর্ণের কথা বলা হইতেছে, তারপর পাঁচটী অঙ্গুলি দেখাইলেই বুঝা গেল যে পবর্গের পঞ্চম বর্ণ বুঝাইতেছে। এই আমরা ম পাইলাম বাকি "ি"। ই স্বরবর্ণ মধ্যে ; সুতরাং হস্তকে সর্পাকার করিতে ও ইহা স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ বলিয়া তিনটী অঙ্গুলি তুলিতে হইবে। ই পাওয়া গেল। এই "ই" যে "ম" র সহিত যোগ হইবে ইহা জানাইবার জন্য একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ বক্র করিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে এই "ই" "ম"র সহিত যোগ হইল।

"ভাল আছি"—

এইরূপে ভ পবর্গের মধ্যে সুতরাং হস্ত দ্বারা বাতাস করার ন্যায় করিতে হইবে, এবং ভ চতুর্থ বলিয়া চারিটী অঙ্গুলি দেখাইতে হইবে। এই ভ পাওয়া গেল। তারপর হস্তকে সর্পাকার করিতে হইবে এবং দুইটী অঙ্গুলি তুলিতে হইবে। তাহা হইলে "আ"কার পাওয়া গেল। এই আ যে "ভ"র সহিত যোগ হইবে ইহা দেখাইবার জন্য আকার দেখাইয়াই একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিবে। যে কোন বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত করিতে হইবে, সেই বর্ণ বলিয়া অঙ্গুলি কুঞ্চিত করিবে।"

এইরূপে সমস্ত বর্ণমালা বলিতে পারা যায়। কবর্গের বর্ণ হইলে হস্তকে কুম্ভের মত আকার করিবে।

চবর্গের বর্ণ হইলে একটী অঙ্গুলি কুম্ভকারের চাকা ঘুরাইবার মত করিবে। পরে বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

টবর্গের বর্ণ হইলে ধনু হইতে শর নিক্ষেপের সময় হস্ত যেরূপ করা হয়, সেই রূপ করিবে। এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি দেখাইবে।

ত বর্গের বর্ণ হইলে—কোন দ্রব্য কাটিবার সময় অস্ত্র যেরূপ ভাবে ধরা হয়, হস্তকে সেইরূপ ভাবে রাখিবে, এবং বর্ণ সংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

পবর্গের বর্ণ হইলে পাখার দ্বারা যেরূপে বায়ু সঞ্চালন করা হয়, হস্ত দ্বারা সেইরূপ ভাব করিবে, এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিতে হইবে।

যখন "য" অন্তস্থ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত কোন বর্ণ বুঝাইতে হইবে তখন বাম হস্ত চিৎ করিয়া রাখিয়া তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া রাখিবে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাঁতা বুঝাইল। তাহার পর বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

এ কথাটী যেন মনে থাকে যে যুক্তবর্ণের সময় অন্য নিয়ম। মনে করুন —"ম" এর সহিত ব যোগ করিতে ইচ্ছা করি "ম্ব" তখন ম বলিয়া তাহার পর "ব"র

সঙ্কেত করিয়াই একটী অঙ্গুলী বক্র করিবে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে ব" ম"র সহিত যুক্ত হইল।

এই সঙ্কেত দ্বারা দিবাভাগে ও রাত্রিকালে আলোকে কথা কহা চলিবে। অন্ধকারে কথা কহিবার পৃথক্ নিয়ম, সেও সহজ। আগামী বারে উহা প্রকাশ করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

গৌরী।

রামপ্রসাদের কবিত্ব অসাধারণ, কল্পনা অতুলনীয়। একটী উপায়ে বিশ্বমোহিনী বিশ্বমাতার কোটিচন্দ্রনিভাননের ঐশ্বর্য্যরাশি বুঝাইলেন, কন্যার আবদার মিটাইলেন, আর স্বামীর দ্বারা সহধর্ম্মিণীর বিভ্রতি ঘুচাইলেন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে কন্যার বিবাহ-চিন্তা পিতার মনে সমুদিত হইল, তিনি গৌরীকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। দেবগণের নির্দেশানুসারে মহর্ষি নারদ শিববিবাহের ঘটকত্ব করিবার জন্য গিরিপুরে উপস্থিত হইয়া গিরিরাজের নিকট তাঁহার কন্যা গৌরীর বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেব পাত্র—এ কথাও তুলিলেন। গিরিপতি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। পার্ব্বতীও বাল্যাবধি মহাদেবকে স্বামিত্বে বরণ করিবার কামনায় পঞ্চতপাদি কঠোর তপশ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কবির বর্ণনায় তাহা পাঠ করুন :—

সুকুমারী সুশোভনা, শশিমুখী ত্রিলোচনা,
হর লাগি হৈল তপস্বিনী।
ত্যজি মা বাপের কোল, না শুনিয়া কারো বোল।
পুণ্যারণ্যে রহে একাকিনী॥
নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, ব্যাঘ্রাজিন পরিধান,
বিভূতি-ভূষণ বরতনু।
ভূষিতা রুদ্রাক্ষমালে অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা ভালে,
মৌনব্রত হয়ে ভাবে স্থাণু॥
যোগশাস্ত্র অনুসারে, সকলি ত্যজিয়া দূরে,
শীর্ণ পর্ণ রহিল আহার।
তাহা ত্যাগ হৈল যবে অপর্ণাখ্যা হয়ে তবে,
পবন ভক্ষণ কৈল সার॥
শীতেতে আকণ্ঠ জলে, নিদাঘে পঞ্চাগ্নি জলে,
বৃষ্টিকালে ভিজে অনুক্ষণ।
মুদিত করিয়া আঁখি, ঊর্দ্ধপদে ঊর্দ্ধমুখী,
ভাবে গৌরী ভবের চরণ॥
মহামন্ত্র জপে মনে, পণ করি ত্রিলোচনে,
লোচনে বহিছে প্রেমধারা।
ভনে দ্বিজ রামেশ্বর, চঞ্চল হইল হর,
চণ্ডীরে দেখিতে আইলা ত্বরা॥

শিবায়ন।

গৌরীর তপস্যা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের বর্ণনা—

তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।
আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে॥
এক পদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ।
মাঘমাসে নিশাকালে উদকে শয়ন॥
দিন এক উপবাস দিনেক ভোজন।
ত্যজিল তাম্বূল তৈল ভূষণ চন্দন॥
দুই উপবাস করি করিলা পারণা।
মহেশ স্বামী হেতু কৈল ধ্যান ধারণা॥
চিন্তিয়া শিবের পদ মুদিত লোচনে।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়মে॥
পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
উর্দ্ধমুখ দিয়া রৈল অরুণমণ্ডলে॥
কৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস।
পারণা করিল শেষে সবে তিন গ্রাস॥
অন্ন ত্যজি খান মাতা কোপিত্থ বদর।
কত কাল পান কৈল কেবল পুষ্কর॥
বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভোজন।
শিবপদ ধ্যান গৌরী করে অনুক্ষণ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র তাজি অন্ন-পান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান॥
ছলিতে আইলা হর দ্বিজ বেশধর।
জিজ্ঞাসিলেন শিব, গৌরী দিলেন উত্তর॥

হিন্দু শাস্ত্রের মতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনই পূর্ব্ব জন্ম হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, বিবাহও তদ্রূপ। তবে যে কাহার কাহার চিরকৌমার্য্য ঘটিয়া থাকে, আদৌ বিবাহ হয় না, তাহা অতি বিরল এবং তাহাও বিধিনির্দ্দিষ্ট। যদি তাহাই হয়, তবে আর তাহার জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন—পাত্র পাত্রী যদি পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত থাকে, তবে আর তপস্যাদির প্রয়োজন কেন—ইহা কেবল কর্ত্তব্য পালন বই আর কিছুই নয়। অদৃষ্টে যাহা আছে, অদৃষ্টবাদীকে তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিয়া লইতে হইলেও চেষ্টা ও যত্ন চাই। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না, মনস্তৃপ্তির জন্য চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন হয়, বিশেষতঃ অদৃষ্ট অজ্ঞাত—ভবিতব্যতার বিষয়ে কেহই নিশ্চিত হইতে পারে না, সুতরাং অভীপ্সিতের সিদ্ধি জন্য নানা উপায় দেখিতে হয়। তজ্জন্যই গৌরীর তপস্যা। তিনি আপনার ভবিতব্যতা অবগত ছিলেন না, অথচ তাঁহার ঐকান্তিকী কামনা শিবকে তিনি স্বামিরূপে প্রাপ্ত হয়েন।

হিন্দুর পতি-পত্নীত্ব দুই দিন, দশ দিন বা দুই এক বৎসরের জন্য নহে। হিন্দুর এই সম্বন্ধ জীবনে মরণে অবিচ্ছিন্ন। যাহাদের এ সম্বন্ধ চুক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, মনে করিলেই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, তাঁহারা যখন বিবাহসম্বন্ধ সংস্থাপনের পূর্ব্বে পতি পত্নীর মনোভাব যথাসম্ভব অবগত হইবার জন্য সচেষ্ট, তখন হিন্দুর তাহাতে নিবৃত্ত থাকা কখন সম্ভবপর নহে। তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের যতটা বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি, হিন্দুর ততটা নহে। দেবাদিদেব • অলক্ষ্যজন্মা এবং স্থবির হইয়াও গৌরীর বরমাল্য লাভ সুকৃতিজনক না ভাবিয়া যখন তাঁহার পতিনিষ্ঠার পরীক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অনায়াসলভ্য নহেন। তাঁহার বিলক্ষণ

দর ছিল, মনে করিলেই যে কেহ তাঁহাকে পতিরূপে পাইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

গৌরীর একাগ্রতা পরীক্ষার জন্য মহাদেব স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া তপস্যানুরতা পার্ব্বতীর সম্মুখীন হইলেন, এবং নিম্নোক্ত প্রকারে শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন,—

কহ লো নিরুপমা,　　কাহার বোলে রামা
　　ইচ্ছিলা বুড়া জটাধরে।
হইয়া সুনারী,　　ভজহ ভিখারী,
　　দরিদ্র বর দিগম্বরে॥
কহ লো রূপবতী,　　দেহের হেম পুতি,
　　মাণিকরুচিরদশনা।
তৈল নাহি ঘরে,　　ইচ্ছিলে হেন বরে,
　　হইবে বিভূতিভূষণা॥
গলায় হাড়মাল,　　বসন বাঘছাল,
　　উত্তরী যার বিষধর।
প্রেত ভূত সঙ্গে,　　চিতাধুলি অঙ্গে,
　　ইচ্ছিলে কেন হেন বর॥
কাহার পুত্র হর,　　না জানি কোথা ঘর,
　　না দেখি ভাই বন্ধু জনে।
বরিয়া শূলপাণি,　　হইবে দুখিনী,
　　দারুণ দৈব কারণে॥
শুন লো চন্দ্রমুখি!　তোমারে আমি দেখি,
　　রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর,　　ভুবনে মনোহর,
　　ইচ্ছিলে বুড়া বর কেনি॥
দরিদ্র পতি যার,　　বিফল জন্ম তার,
　　দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।
শুন লো গুণময়ি,　তোমারে আমি কই,
　　দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে॥
থাকিয়া হরশিরে,　　ভিক্ষুকের ঘরে,
　　মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে।
শুন লো গুণময়ি!　তোমারে হিত কই,
　　দরিদ্রে কেহ না আদরে॥

কবিকঙ্কণ।

ভারতচন্দ্র গৌরীর তপস্যা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে শিবের গৌরী পরীক্ষা কিছুই বর্ণনা করেন নাই। তবে রামেশ্বর যেরূপ ঐ দুইটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে;—

পশুপতি পাবো পতি পুষ্ট করি পুণ্য।
কেবল কঠোর তপ করি এই জন্য॥
হি হি করি হাসিল ব্রাহ্মণ ইহা শুনে।
বাসনা করেছ বিদগধ জানি॥
সে শিবকে সমর্পিবে সোণা পান্না দে।
হাতে তুলি বিষ খেতে বলে দিল কে॥
শিবের সংবাদ কিছু শুন নাই পারা।
বিকট বদন বড় বিপরীত ধারা॥
ভক্ষণ ভাঙ্গের গুঁড়া ভস্ম বিভূষণ।
সদাই শবের প্রায় শ্মশানে শয়ন॥
প্রেত ভূত প্রমথ পিশাচ লয়ে সঙ্গ।
গায়ের যোগীয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ॥
বেড়ে সাপ গাময় গলায় হাড়মালা।
জটায় জাহ্নবী যায় কুম্ভীরের বেলা॥
করে ব্রহ্মকপাল, কপালে দাবানল।
মদন মরিল পুড়ে হইয়া বিকল।
কোমলাঙ্গী কেমনে তিষ্ঠিবে তার কোলে।
জীবন্তে জ্বলিবে যেন জ্বলন্ত অনলে॥
শুনিতে সুন্দর শিব, সেবিতে সুন্দর।
দেখিতে সে দারুণ দরিদ্র দিগম্বর॥

গঙ্গাকে গৌরব করি ধরেছিল শিরে।
গড় করি গেল সেই রত্নাকরনীরে॥
লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্দ্ধভাবে অপূর্ণ আছেন দিগম্বর॥
দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর।
সত্ত্বগুণ থাকিলে সকল যায় মার॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাম—পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি॥
বুড়া কত কালের বলিতে নারে কেহ।
চলে যেতে ঢলে পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ॥
বড় বলি বাসনা করেছ বুড়া বরে।
ভিক্ষা মাগি খায় ভুঞ্জে ভাঙ্গ নাহি ঘরে॥
জ্বলিবে জঠরানল জীবে কতকাল।
এক মুখে পঞ্চমুখ বড়ই জঞ্জাল॥
কি দেখি পড়েছ ভুলে ভূপতির ঝি।
মোরে বল ভাল বরে আমি এন্থা দি॥
কুমারী বলেন কিছু কন্থা নাঞি আর।
গড় করি গোসাঞি তোমাকে পরিহার॥
বুড়ালে ব্রাহ্মণকুলে ব্রহ্ম নাহি জান।
কহি কিছু কৃপা করি কাণ পাতি শুন॥

শিবায়ন।

ব্রাহ্মণবেশে গৌরীকে শিবের ছলনায় উভয় কবিই বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ছন্দ এবং পদবিন্যাস গুণে প্রথমোক্ত কবিতা বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। উভয়েই আদর্শ মহাকবি কালিদাস এবং কবিতা দুইটীই কালিদাসের কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী-পরিণয়ের ছায়া। পতিপ্রাণা আদর্শ সতী গৌরীর প্রত্যুত্তর উভয়ত্রই সমান। তবে কবিকঙ্কণ অল্প কথায় সারিয়াছেন, আর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
শিবনাম করিলে সন্তাপ যায় দূর॥
কুশলার্থ কৃতার্থ করুণাময় নিধি।
ব্রহ্মবীজ বিশ্বনাথ বিধাতার বিধি॥
চন্দ্রচূড় বিনা চিরজীবী নহে কেহ।
কাল পেয়ে মরেন, ধরেন যত দেহ॥
শুদ্ধসত্ত্ব শিবমূর্ত্তি সদানন্দময়।
ঈশ্বর অজরামর অক্ষয় অব্যয়॥
শিবব্রহ্ম শিবব্রহ্ম শিবব্রহ্ম সার।
শিবসম সুখসেব্য সুরে নাহি আর॥
শিব হৈতে সকল, সকলে সদাশিব।
মায়াতে মোহিত হয়ে জানে নাই জীব॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যত হয় রাজা।
সবাকার সম্পদে শিবের করি পূজা॥
রাজা রাম রাবণে বধিল যার বলে।
হেলায় বান্ধিল সেতু সমুদ্রের জলে॥
রামে বর দিয়া রামেশ্বর অভিধান।
তুষ্ট তূর্ণ অপূর্ণ কামের পূর্ণ কাম॥
ভীষ্মক ভূপের বেটী ভক্তি করি ভবে।
কামিনী ভবনে বসি ভগবান্ লভে॥
বাণে বর দিয়া বাণেশ্বর অভিধান।
লোকগুরু কল্পতরু প্রভু ত্রিনয়ন॥
অমঙ্গলশীল কিন্তু মঙ্গলের মূল।
সেজন সুকৃতি শিব যারে অনুকূল॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি আছে করতল।
শুভদাতা সদাশিব সেবকবৎসল॥
যোগেন্দ্র পুরুষ জন্ম জরা কৈল জয়।
তেঁই তাঁর দাসী হতে অভিলাষ হয়॥

শিবায়ন।

কবিকঙ্কণ এতটা বিস্তার না করিয়া অল্প কথায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও গৌরীর মনোভাব বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে।

অণিমা লঘিমা আদি যার অষ্ট সিদ্ধি।
যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি॥
ত্রিভুবনে দেখি যার পরম সম্পদ।
কেবা সেবা নাহি করে মহেশ্বর-পদ॥
ত্রিভুবন রাখিলা করিয়া বিষপান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনা বর কেবা আছে আন॥

গৌরীর উত্তর পাইয়া ছদ্মবেশধারী শিব গৌরীর দৃষ্টির উপরেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তর দান সমাপ্ত হইবামাত্র পার্ব্বতী দেখিলেন, যে ব্রাহ্মণের সহিত তিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনি আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন, স্বয়ং শিব। কবিকঙ্কণ কিন্তু তাহা না করিয়া গৌরীকে কিয়ৎকালের জন্য স্থানান্তরিত করিয়া পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বলেন দেখা হবে দুয়ে একে।
তখন ত্রিপুরা তাঁকে ত্রিলোচন দেখে॥
শিবায়ন।

তপস্বীর দেখি কিছু চঞ্চল অধর।
সেই স্থান ছাড়ি গৌরী চলে অন্তর।
এমন সময়ে হর নিজ রূপ ধরি।
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারী॥
কবিকঙ্কণ।

যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্র যিনি সুরনরকিন্নরাদি যে কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহে সক্ষম, তাঁর ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ জন্য পার্ব্বতীর নয়নান্তরালের প্রয়োজন কি? এইখানেই প্রকৃত প্রস্তাবে হরগৌরীর পরিণয় কার্য্য সমাধা পায়; পার্ব্বতী শিবগলে বরমাল্য অর্পণ করেন।

এই বিবাহ উৎসবে পরিণত করিবার জন্য সমুচিত আড়ম্বরের অনুষ্ঠান হয়। শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া দেবগণ পশুপতি-পরিণয়ার্থে কৈলাসক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া মহা আড়ম্বরে বর লইয়া হিমাদ্রিশিখরে উপনীত হয়েন। তথায় হিমগিরিপতির দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া সকলেই বিবাহসভা পবিত্র করেন। দেবাদিদেব দেবকুল-প্রথানুসারে পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিলে দেবগণ পরমানন্দ লাভ করেন।

বিবাহস্থলে শিবের দিগম্বরমূর্ত্তি ধারণ উপলক্ষ্য করিয়া কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর এবং ভারতচন্দ্র তিনজনেই একটা রহস্যের তুমুল তরঙ্গ তুলিয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের প্রবণতা প্রদর্শন জন্য মেনকাচরিত্রে প্রাকৃত ভাবের আরোপ করিয়াছেন—জামাতার দিগম্বরমূর্ত্তি দর্শনে তিনি ভীতা, চকিতা এবং কিয়ৎকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। পরক্ষণেই জামাতার অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্য দর্শনে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

গৃহচিকিৎসা—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। আঞ্জনীতে। আকন্দ গাছের আঠা, ডান চক্ষে হইলে বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠে এবং বাম চক্ষে হইলে ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠে দুই ফোঁটা লাগাইলে আঞ্জনী ফাটিয়া যাইবে।

২। চাতুর্থক জ্বরে অর্থাৎ ২ দিন অন্তর জ্বরে। জ্বরের দিবস প্রাতে শ্বেত অপরাজিতা ফুলের লতা, পুরুষের ডান হাতে এবং স্ত্রীলোকের বাম হাতে অনন্তের ন্যায় পরাইয়া দিলে আর জ্বর হইবে না।

৩। স্বপ্নচ্যুতিতে। প্রতি রোজ রাত্রিতে শয়নকালীন কাবাব চিনি চূর্ণ ৵০ আনা ও কাশীর চিনি ৵০ আনা একসঙ্গে সেবন করিলে উপকার হইবে।

৪। বাধকবেদনায় ঋতুর তিন দিন, প্রত্যহ চাটিম কলা গাছের শিকড়ের রস চিনি সহ একবার করিয়া সেবন করিলে ব্যথা নিবারণ হইবে।

৫। কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতি স্ফোটকাদি রোগে নূতন অবস্থায় কণকচাঁপা ফুল কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ কিম্বা পটী দিলে বসিয়া যাইবে।

৬। বিকচ অর্থাৎ কাউর ঘায়ে। নূতন ঝাউপাতা, বেতের ডগা, শুঁড়ি কচুর ডাটা সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া এবং তদুপরি কদম পাতা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে আরোগ্য হইবে।

৭। নেত্ররোগে। কবুতরের বিষ্ঠা মধু দ্বারা মাড়িয়া অঞ্জন দিবে।

৮। বাগীতে। কুক্কুটডিম্বের কুসুম ও মেটেসিঁদুর একত্র করিয়া নেকড়ায় মাখিয়া বাগীর উপর বসাইয়া দিলে বসিয়া যাইবে।

৯। সূতিকা রোগে, কমই গাছের মূল ১ তোলা বাটিয়া অপর মসলার সহিত ৭টী কৈ মাছের ঝোল করিয়া খাইবে। ঐ খাইতে যখন তিক্ত বোধ হইবে তখন বুঝিবে যে রোগ আর নাই।

নূতন সংবাদ।

১। নাগপুরে কতিপয় দুর্বৃত্ত তত্রতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। তথাকার অধিবাসিগণ এই দুর্বৃত্তদিগের নীচ কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং একটী নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

২। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর আনন্দ চার্লু দেহত্যাগ করিয়াছেন।

৩। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষোন্নতি সভা আগামী বৎসরে দুইটী ১০০৲ টাকার, পাঁচটী ৫০৲ টাকার ও দশটী ২৫৲ টাকার বৃত্তি প্রদান করিবেন এবং জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইবার জন্য কতকগুলি জাহাজ ভাড়া দেওয়া হইবে। ৩০ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃত্তিপ্রার্থিগণকে উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের নামে ৬নং ওল্ড্‌ পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

৪। পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের নৈতিক সাধন জন্য ও আর্থিক অবনতির কারণ দূর করিবার নিমিত্ত এক সভা সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। রুষিয়ানিবাসী ইস্মাইল খাস ব্রিন্‌স্কি এই প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই সভার প্রথম অধিবেশন মিশর কাইরো নগরে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৫। বঙ্গীয় কারাগারসমূহে কতক গুলি দুর্ঘটনা ঘটায় কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গালী জেলার ও ওয়ার্ডর্স পরিবর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে ইংরাজ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

৬। হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ সহরে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৭। লক্ষ্ণৌ সহরে পার্দ্দানশীন মহিলাদিগকে কলা ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য ছোটলাটপত্নী লেডী হিউয়েট এই বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

বামারচনা।

আশীর্ব্বাদ।

স্নেহের পুতুল তুই স্নেহ-পারাবার,
ত্রিদিবের সুখ শান্তি করি অবহেলা,
কেন এ কণ্টকাকীর্ণ ভব-কারাগার,
তার মাঝে? খেলিবারে? সমরখেলা।

অমরাবতীর শোভা! মন্দার কুসুম!
মন্দাকিনী-লহরীর সম নিরমল,
গোলাপের আভা তুই—কস্তুরী কুঙ্কুম,
দেববালকের সম সুন্দর সরল।

নব কিশলয় সম কোমল বিমল,
কোকিলের কুহুতান সম স্নিগ্ধ তুই,
মকরন্দ ভরপুর নলিনীর দল;
সন্ধ্যার রজনী-গন্ধা প্রভাতের জুঁই।

আসিলি কি সবাকারে সুখী করিবারে,
কিম্বা দুদিনের তরে ফাঁকী দিতে শুধু,
চাহেনা পরাণ তোরে ভালবাসিবারে,
চাহেনা লভিতে তোর সরলতা মধু।

স্বরগের ভালবাসা মান অভিমান,
আদর সোহাগরাশি, পুণ্য পবিত্রতা
ওঁয়া ওঁয়া কান্না, হাসি সুধার সমান,
লয়ে আয়, বুকে আয় স্নেহমাখা-লতা।

দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়ে মাথায়,
অতিথি! আইস গৃহে লয়ে সুমঙ্গল,
তোর স্পর্শে গৃহ তোর শান্তির আলয়,
শান্তিকণা! ঢাল বক্ষে শান্তি সুবিমল।

সুরুচিবালা সেন।

বিষাদে। *

মরমের দীর্ঘশ্বাস,
পরাণের হা হুতাশ,
বুকভরা দুঃখোচ্ছ্বাস
কেহতো বোঝেনা হায়!
বহে তপ্ত অশ্রুজল,
শতধারে অবিরল,
ভেসে যায় হৃদিতল,
কেহ তো দেখেনা তায়।

কেহ তো বোঝেনা মোর,
প্রাণে কি বেদনা ঘোর,
কারো তো নয়নলোর,
ঝরেনাকো মোর তরে।
কেহ তো আসে না হেথা,
জানাইতে সম ব্যথা,
কহেনাকো দুটী কথা,
মোর সনে স্নেহভরে।

দারুণ সংসার পায়,
দলিত হইয়ে হায়!
হৃদয় টুটিয়ে যায়,
প্রাণ জ্বলে যাতনায়;
অনাদর অপমান,
বিষময় বাক্যবাণ,
করে হৃদি শতখান,
তবু বেঁচে আছি হায়!

সংসারের উপেক্ষায়,
সতত কম্পিত কায়,
ত্রাসে বুক ফেটে যায়
আকুল ব্যথিত প্রাণ।
শুধু তব আশে হরি!
তব পদ হৃদে ধরি,
তোমারে স্মরণ করি,
আছি আজো ভগবান্!

যেন দেব এই ভাবে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে;
জীবন কাটিয়া যায় কর্ত্তব্য মাথায় লয়ে।

---

* কোন উৎপীড়িতা বিধবার আক্ষেপ।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 545. — January, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৫ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩১৫। জানুয়ারি, ১৯০৯।	৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিচারপতির বিদায় গ্রহণ—কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত জষ্টিস সারদা চরণ মিত্র মহোদয়ের কার্য্যকাল বিগত ১০ই ডিসেম্বর শেষ হইয়াছে। এদিকে বীরভূমের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসনস্ জজ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় মহাশয়ও কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী, নিরপেক্ষ, বুদ্ধিমান্ বিচারকের আরও কিছুকাল ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

টেলিগ্রাফের মাশুল—আগামী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে কেবল দুই শ্রেণীর টেলিগ্রাফ চলিবে। ১ম "এক্সপ্রেস" বা দ্রুতগামী, ২য় "অর্ডিনারি" বা সাধারণ। "এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফে ১২ কথা এক টাকায় যাইবে এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্য দুই আনা হিসাবে লাগিবে। "অর্ডিনারি" টেলিগ্রাফে ১২ কথায় ছয় আনা এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত কথায় অর্দ্ধ আনা দিতে হইবে।

কাপড়ের কল—দেশীয় মূলধনে, কারিকরের পরিশ্রমে পরিচালিত বাঙ্গালায় প্রথম কাপড়ের কল—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। সম্প্রতি "গণেশ ক্লথ মিলস্ লিমিটেড" নামে আর একটী কাপড়ের কল হাওড়ার নিকটবর্ত্তী লিলুয়া ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপ কলের বহুল প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়াছে।

ধন্যবাদ সভা—ভারতীয় শাসন-সংস্কারে গভর্ণমেন্ট উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে নানা স্থানে সভা সমিতি হইতেছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত দাদাভাই, বলিয়াছেন যে তিনি এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ের জন্য পরিশ্রম

করিয়াছেন, ইহাতে তাহার কতকাংশ সফল হইয়াছে।

কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন দুই স্থানে হইবার কথা চলিতেছিল—নাগপুরে ও মান্দ্রাজে। নাগপুরের অধিবেশন বন্ধ হইয়াছে। কেবল রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে এবার কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে।

মাহিলা-শিল্পাশ্রম—বিগত ৪ঠা পৌষ শনিবার ছোটলাটমহিষী লেডি বেকার শিবনারায়ণ দাসের লেনে মহিলা-শিল্পাশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। মহিলাবৃন্দের কারুনৈপুণ্য সন্দর্শনে লাটপত্নী প্রীত হইয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা—এদেশে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ যে মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এখনও ভারত-গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। এ বিবেচনায় সুফল ফলিবার আশা করা যায়।

রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ—এবার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন—শ্রীযুক্ত নব গৌরাঙ্গ বসাক এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এম, এ। উভয়েই দুই বৎসর কাল বাৎসরিক চৌদ্দ শত টাকা বৃত্তি পাইবেন। যদি ইতিমধ্যে কাজ ভাল দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে বৃত্তিকাল আরও বাড়িয়া যাইবে। বসাক মহাশয় পদকও পাইয়াছেন।

লাটকন্যার পরিণয়—বড়লাট-দুহিতা লেডি ভাইলেট ইলিয়টের পরিণয়কাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কন্যার শ্বশ্রূ লেডি ল্যান্সডাউন নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও উপঢৌকন লইয়া ভারতে আসিতেছেন।

দ্বারবঙ্গে পর্দ্দানশীন ফণ্ড—পর্দ্দানশীন দুঃস্থ মহিলাগণের সাহায্যের জন্য দ্বারবঙ্গে একটী ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই ফণ্ডের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত বিগত ২২শে ডিসেম্বর জেলাজজ মিঃ ফিটির সভাপতিত্বে একটী মহতী সভা হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিঃ সুন্দরলালের চেষ্টায় ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইগারটনের সহানুভূতিতে এই সভায় অনেক টাকা উঠিয়াছে। সঙ্কল্প সাধু।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।

৺কাশীধাম বহুতর দণ্ডীর বাসস্থান। দণ্ডীরা বৈষ্ণবগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী দণ্ডীর কথা স্বতন্ত্র; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কাহাকেও দ্বেষ করেন না। বৈষ্ণবদ্বেষী দণ্ডীরা তুলসীদাসের প্রভাব ও প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া